দৈনিক বজ্রশক্তি
Dainik Bajroshakti

সংকলন

রেজি: ডিএ ৬২৬৯, সংখ্যা-১১।
আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৩ । অক্টোবর ২০১৬।
মহরম ১৪৩৮ । ৩২ পৃষ্ঠা ১০ টাকা

পাক-ভারত যুদ্ধ কি অবশ্যম্ভাবি?

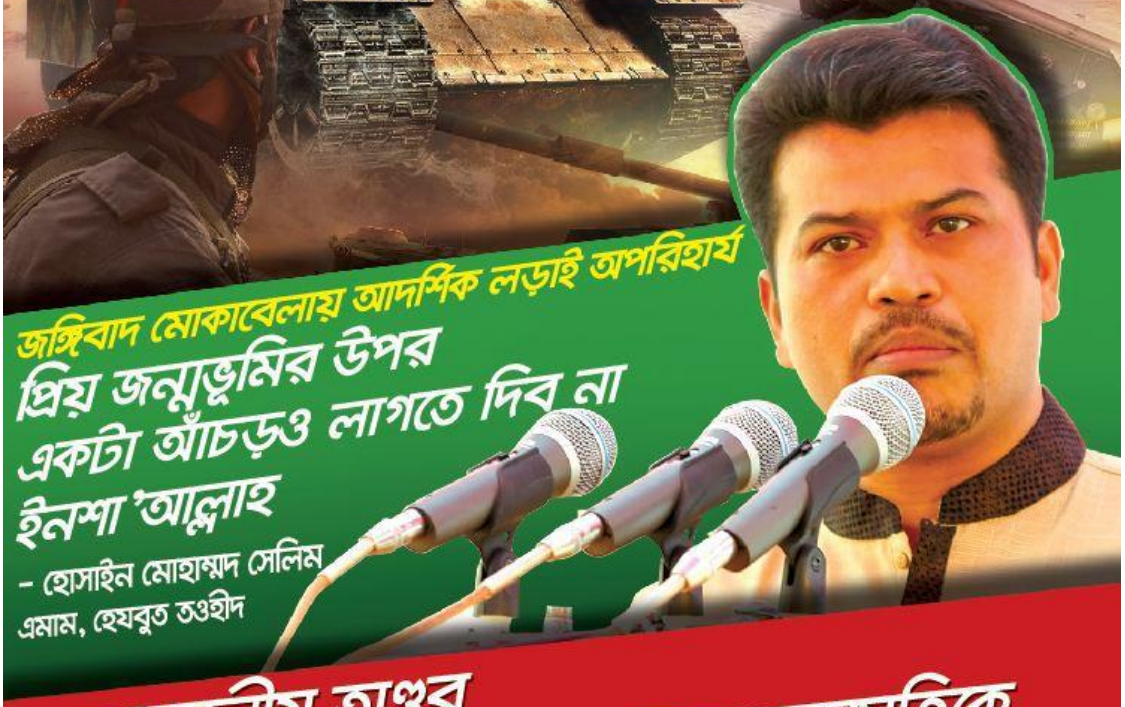

জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় আদর্শিক লড়াই অপরিহার্য

প্রিয় জন্মভূমির উপর একটা আঁচড়ও লাগতে দিব না ইনশা'আল্লাহ

– হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম
এমাম, হেযবুত তওহীদ

দাজ্জালীয় তাণ্ডব ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে মানবজাতিকে

সম্পাদকীয়

ঐক্যসূত্রের পথনির্দেশ

যাবতীয় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য এখন অপরিহার্য। জাতীয় ঐক্যের উদাহরণ হিসাবে একাত্তরের কথা বলা যেতে পারে। তখন পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি মানুষ ধর্ম-বর্ণ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করেছিল। জাতীয় ঐক্যের পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট থাকে। যখন জাতির অস্তিত্বের সংকট আসে তখন জাতির মধ্যে কোনো বিভেদ থাকলে চলে না। সবাই মিলে জাতির স্বাধীনতা, জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এক হয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করতে হয়।

এ কথাগুলো বলার কারণ হচ্ছে, আমাদের সামনেও এমনই একটি সংকটকাল উপস্থিত হয়েছে। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন সামলাতে এতটাই মগ্ন যে বিশ্বময় সন্ত্রাসবাদ, বৈশ্বিক সংকট, আঞ্চলিক সংকট, জাতীয় সংকট, সামাজিক সংকট এক কথায় কিছুই আমাদের চিন্তায় রেখাপাত করে না, আত্মকেন্দ্রিকতার ঘেরাটোপের বাইরে গিয়ে দেশ ও জাতির জন্য কিছু করার সময় আমাদের নেই। ঘরের পাশে যুদ্ধের দামামা বাজছে, এতে যে আমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি সে চিন্তা কারোর মধ্যে নেই। প্রদর্শনের এই যুগে ধর্ম, মানবতা আর দেশপ্রেমটাও প্রদর্শনীর সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু যখন বাস্তবসংকট উপস্থিত হয়, তখন প্রদর্শনমূলক মানবতা আর দেশপ্রেম দিয়ে জাতিরক্ষা হয় না। তখন লাগে সত্যিকার জাতীয় ঐক্য।

প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কোন জাতির ঐক্যের কথা বলছি? আপাতত আমরা এই বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে বসবাসকারী মানুষগুলোকে একটি জাতি বলে চিহ্নিত করছি। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতবাদের ভিত্তিতে এই মানুষগুলো হতে পারে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। কেউ মাদ্রাসা পড়ুয়া কেউ ভার্সিটি পড়ুয়া, কেউ আস্তিক কেউ নাস্তিক, কেউ ইসলামবিদ্বেষী কেউ ইসলামপ্রেমী, কেউ গণতান্ত্রিক কেউ সাম্যবাদী, কেউ মুসলিম, কেউ হিন্দু কেউ বৌদ্ধ কেউ আদিবাসী। কিন্তু জাতীয় ঐক্য যখন একান্তই অনিবার্য তখন কীভাবে ঐ সব বিভেদের বেড়াকে পার হওয়া যায় সে চেষ্টাই আমাদেরকে করতে হবে, যদি আমরা এদেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে চাই, নিজেদের ও নিজেদের পরিবারকে রক্ষা করতে চাই। আমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি ৯৯ টি বিষয়ে মতান্তর থাকে এবং একটি মাত্র বিষয়ে আমরা একমত হতে পারি তাহলে সেই একটি কথাকেই ঐক্যসূত্র হিসাবে ধারণ করে আমাদের এখন এক শক্তিশালী জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

আমরা যদি ধর্মের মূল শিক্ষার দিকে লক্ষ্য করি দেখব প্রতিটি ধর্মের কথা হচ্ছে মানুষের কল্যাণ সাধন তথা মানবতা। উপাসনা পদ্ধতির পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা মানবতার কল্যাণের চিন্তা থেকে সবাই ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। আমরা যদি বাঙালি জাতীয়তাবাদকে বিবেচনায় নেই তাহলে দেখব সব ধর্মের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ক্ষেত্রে এই পরিচয়ও কোনো প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায় না। এভাবে সমাজে বিরাজিত প্রতিটি চেতনার উদ্ভব হয়েছে মানুষের ও দেশের কল্যাণের চিন্তা থেকে। আমরা দেশের এই সংকটকালে সেই ঐক্যচিন্তাটিকেই প্রাধান্য দিয়ে অন্য সব ছোট খাটো বিষয় আপাতত দূরে সরিয়ে রাখতে পারি। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে দৈনিক বজ্রশক্তিতে সম্প্রতি প্রকাশিত বাছাই করা কিছু প্রবন্ধকে একত্র করে এই সংকলনটি প্রকাশ করা হলো।

সূচিপত্র

- *পাক-ভারত যুদ্ধের দামামা পারমাণবিক হুমকির মুখে বিশ্ব* -২
- *ধর্ম কী?*-৬
- *ইসলাম কীভাবে মানুষের হৃদয় জয় করেছিল?*-৭
- *আত্মসমালোচনা ঐতিহাসিক ব্যর্থতার দায় বহন করছে মুসলিম জাতি*-৯
- *মাতম করা নয় প্রয়োজন আত্মোপলব্ধি*-১১
- *আকিদা-ঈমান-আমল*- ১৩
- *প্রিয় জন্মভূমির উপর একটা আঁচড়ও লাগতে দেব না ইনশাল্লাহ*- ১৬
- *বিশ্বের প্রধান সমস্যা সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় আমাদের প্রস্তাবনা*- ২৫
- *দাজ্জালীয় তাণ্ডব ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে মানবজাতিকে সতর্ক হওয়ার এখনই সময়*- ২৭
- *ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিল্পকলা এক সূত্রে গাঁথা*- ২৯
- *বদলে যাওয়া টাইগার ক্রিকেট এক থেকে একশ' জয়ের মাইলফলক*-৩১

প্রকাশক ও সম্পাদক: এস এম সামসুল হুদা ১৩৯/১, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ কর্তৃক মানিকগঞ্জ প্রেস, ৪৪ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। **উপদেষ্টামণ্ডলী:** মসীহ উর রহমান, উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী, রুফায়দাহ পন্নী, **বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়:** ২২৩, মধ্য বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪, ০২-৭২১৮১১১, ০২-৮১১৯০৭৬, ০১৭৭৮-২৭৬৭৯৪, **বিজ্ঞাপন বিভাগ:** ০১৮১৬৭১২১৫৮ ওয়েব: www.bajroshakti.com ই-মেইল: bajroshakti@gmail.com

পাক-ভারত যুদ্ধের দামামা

পারমাণবিক হুমকির মুখে বিশ্ব

◆ আতাহার হোসাইন ◆

উপমহাদেশের পরমাণু শক্তিধর দেশ ভারত এবং পাকিস্তান যুদ্ধের মুখোমুখি। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে জন্মলগ্ন থেকে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে আছে দেশ দু'টো। সম্প্রতি বুরহান ওয়ানি নামের একজন কাশ্মীরি তরুণ ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পুরো কাশ্মীর উপত্যকা। লাগাতার কারফিউ, বিক্ষোভ চলমান অবস্থায় এ পর্যন্ত ৮৭ জনের বেশি কাশ্মীরি হত্যার শিকার হয়েছে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে। প্রতিরোধের মুখে আহত হয় সেনাসহ আরো বহু মানুষ। সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা ইন্টারনেট, সংবাদপত্র, টেলিভিশন বন্ধ করে দিয়ে চলতে থাকে কার্ফিউ। এরই মধ্যে গত ১৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানপন্থী কোনো গোষ্ঠীর চারজন সদস্য উরির একটি সেনা ফাঁড়িতে আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে ১৮ জন ভারতীয় সৈনিককে হত্যা করে। এ ঘটনায় ভারত বরাবরের মতো পাকিস্তানকে দোষারোপ করে। এ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে চলতে থাকে উত্তেজিত বাক্য বিনিময়। দুই দেশই পুরোপুরি যুদ্ধংদেহী অবস্থানে চলে যায়। পাশাপাশি দুটো দেশের পত্র-পত্রিকা ও টেলিভিশনগুলো যুদ্ধের বাতাবরণ সৃষ্টি করে। বিশেষ করে ভারতীয় মিডিয়া ও সাধারণ জনতা প্রতিশোধ হিসেবে পাকিস্তানে হামলা করার জন্য চাপ দিতে থাকে। প্রতিদিনের সংবাদপত্র ও সোস্যাল মিডিয়াগুলোতে যুদ্ধের আহ্বান জানানো হয়। পত্র-পত্রিকার নিবন্ধগুলোতে প্রকাশিত হতে থাকে কার কত সামরিক শক্তি আছে, কে কার চাইতে কোনদিক দিয়ে এগিয়ে আছে তার হিসাব-নিকাশ।

এরই মধ্যে ২৯ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে ভারতীয় একটি কমান্ডো বাহিনী সজ্জিত হয়ে 'সীমান্ত রেখা অতিক্রম' করে পাকিস্তানে হামলা চালানোর দাবি করে। ভারত দাবি করেছে গোয়েন্দা সূত্রের আলোকে তারা নিশ্চিত হয় জঙ্গি-সন্ত্রাসীরা ভারতে হামলা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তাই তারা জঙ্গিদেরকে ধ্বংস করতে সীমানা অতিক্রম করে আস্তানাগুলোতে সার্জিকেল স্ট্রাইক করে। এতে ৩৭/৩৮ জন জঙ্গী নিহত হয় বলে দাবি ভারতের। তবে পাকিস্তান দাবি

করেছে ভারতের এই হামলায় তাদের দুই সৈন্য নিহত হয়েছে মাত্র। পাকিস্তানের দাবি মতে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে বরং ভারতেরই ৮ নিহত এবং একজন গ্রেফতার হয়। ভারত তাদের সৈন্য নিতহ হওয়ার কথা অস্বীকার করলেও একজন সৈন্য গ্রেপ্তারের দাবি স্বীকার করে। এভাবে দুই দেশ একেক সময় একেক তথ্য দেওয়অ সত্যিকার অর্থে সেখানে কি ঘটছে তা বোঝা মুশকিল হয়ে পড়ে। তবে এভাবে চলতে থাকলে যে কোন সময় বেঁধে যেতে পারে বড় রকম যুদ্ধ। প্রিয় পাঠক, ভারত পাকিস্তানের কার কাছে কত যুদ্ধাস্ত্র আছে তা আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় নয়। এ নিয়ে ইতোমধ্যে সংবাদপত্রে বিস্তর প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। এসব তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে পক্ষে বিপক্ষে ব্যাপক উত্তেজনাও বাড়ানো হয়েছে। যেহেতু আমরা এই ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ চাই না সেহেতু যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট ক্ষতিকর দিকগুলো আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব। আমাদেরকে ভুলে গেলে চলবে না যে দুটো দেশই পারমাণবিক শক্তির অধিকারী। দেশ দুটোর মধ্যে যুদ্ধ পারমাণবিক আক্রমণ পর্যন্ত চলে গেলে গোটা বিশ্বই বিরাট হুমকির মুখে পতিত হবে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশও নিরাপদ থাকবে না।

পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধসমূহ:

জন্মলগ্ন থেকেই ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে শত্রুতা শুরু হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছর ১৯৪৭ সালেই দেশ দু'টি প্রথম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এরপর ১৯৬৫, ১৯৭১ ও সর্বশেষ ১৯৯৯ সালে বড় ধরনের যুদ্ধে লিপ্ত হয়। চারটি যুদ্ধের মধ্যে তিনটি যুদ্ধই হয় কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে। একমাত্র ১৯৭১ সালে যুদ্ধ হয় বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে।

প্রথম যুদ্ধটি শুরু হয় মুসলিম অধ্যুষিত জম্মু-কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে। ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির সময় হিন্দু মহারাজা হরি সিং শাসিত জম্মু-কাশ্মীর ভারত বা পাকিস্তানের অধীন না হয়ে নিজেরা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে থাকার সুযোগ পায়। কিন্তু পাকিস্তান আশঙ্কা করে মহারাজা জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতের সাথে যুক্ত করে ফেলতে পারে। এই আশঙ্কা থেকে উপজাতীয় গোত্রসহ পাকিস্তানি আধা সামরিক বাহিনী কাশ্মীরে হামলা করে বসে। পরবর্তীতে রাজা ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্তিকরণ চুক্তিতে সাক্ষরের মাধ্যমে ভারতকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানায়। এ নিয়ে যুদ্ধ বেধে যায়। পরে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ১লা জানুয়ারি ১৯৪৯ সালে যুদ্ধ বন্ধ করা হয়। যুদ্ধ শেষে দেখা যায় ভারত কাশ্মীরের দুই তৃতীয়াংশ (কাশ্মীর উপত্যকা, জম্মু এবং লাদাখ) এবং পাকিস্তান বাকি অংশ (আযাদ কাশ্মীর, গিলগিট-বালতিস্তান) দখলে নিতে সক্ষম হয়।

১৯৬৫ সালে দেশ দুটোর মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ বেধে যায়। এবারেও যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু সেই কাশ্মীর। ১৯৪৮ সালের কাশ্মীর যুদ্ধ, পরবর্তীকালে কাশ্মীরের একাংশে পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ, জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতে অন্তর্ভুক্তি, জাতিসংঘের ভেতরে ও বাইরে কূটনৈতিক আলোচনা ইত্যাদিতে কাশ্মীরকে পাকিস্তানের সঙ্গে অঙ্গীভূত করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে ভারতে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক সাহায্য ইত্যাদি ঘটনায় পাকিস্তান হতাশ হয়ে পড়ে এবং কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সুদূর পরাহত মনে হয়। আইয়ুব খানের মতো একজন সামরিক শাসকের নিকট একমাত্র সামরিক হস্তক্ষেপ ও যুদ্ধই এই সমস্যার সমাধান বলে প্রতীয়মান হয়। আইউব খান সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, কাশ্মীর সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হলে পাকিস্তান সরকার আর যুদ্ধ করবে না। কারণ কাশ্মীর সমস্যা 'আমাদের নিরাপত্তা ও সমগ্র অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ।' ভারত কর্তৃক 'যুদ্ধ-নয়, চুক্তি' প্রস্তাবের উত্তরে তিনি মন্তব্য করেন, 'যদি কাশ্মীর বিতর্ক থেকেই যায়, তাহলে ভারতের প্রস্তাবিত 'যুদ্ধ-নয়, চুক্তি' গ্রহণ করা অসম্ভব।' মাত্র ১৭ দিনের এই যুদ্ধে দুটো দেশই শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে। এ যুদ্ধে মূলত বিমান ও ট্যাঙ্কের লড়াই-ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

তৃতীয় বড় যুদ্ধটি বাধে বর্তমান বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার রায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দল নিরঙ্কুশভাবে বিজয় অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানি নেতৃত্ব শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গড়িমসি করে। এরই মধ্যে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালো রাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ঢাকার বুকে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে এক অভিযান শুরু করে। এতে ব্যাপক নিরীহ মানুষ নিহত হয়। গ্রেফতার করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে তখন মানুষ দেশব্যাপী প্রতিরোধ গড়ে তোলা শুরু করে দেয়। গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অত্যাচারে মানুষ দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। ভারত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশে প্রেরণ করে। পাকিস্তানি হানাদারদের অত্যাচারে অন্তত ৩০ লাখ মানুষ খুন হয়। ধর্ষিত হয় প্রায় দুই লাখ নারী। আর জ্বালাও পোড়াওয়ের মাধ্যমে অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি তো রয়েছেই। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধের শেষ দিকে পাকিস্তানি বাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ডিসেম্বরের ৩

তারিখে পাকিস্তান ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের ১১টি এয়ারবেসে আচমকা হামলা করে বসে। এতে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায়। ভারত পাকিস্তানের পূর্ব কমান্ডের উপর আক্রমণ চালায়। মাত্র ১৩ দিনের যুদ্ধে পাকিস্তানের পূর্ব কমান্ড ভারত এবং বাংলাদেশের যৌথবাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজয় স্বীকার করে নেয়।

চতুর্থ যুদ্ধটি বাধে ১৯৯৯ সালে। এ যুদ্ধ কারগিল যুদ্ধ নামে সমধিক পরিচিত। এ বছরের মে-জুলাই মাসে কাশ্মীরের কার্গিল জেলায় পাকিস্তানি ফৌজ ও কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ডি ফ্যাক্টো সীমান্তরেখা হিসেবে পরিচিত নিয়ন্ত্রণ রেখা বা লাইন অফ কন্ট্রোল পেরিয়ে ভারতে ঢুকে পড়লে এই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি: দুই দেশের মধ্যে প্রথম যুদ্ধটাই হয় দেশ দুটো ভালো করে দাঁড়ানোর আগেই। তখন পর্যন্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামো ভালোভাবে দাঁড়াতেই পারেনি। ১ বছর ২ মাসব্যাপী এই যুদ্ধে ভারতের পক্ষে সৈন্য মারা যায় ১৫০০ এবং পাকিস্তানের সৈনিক মারা যায় ৬০০০। আর আহতের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৫০০ ও ১৪,০০০। আর অর্থনৈতিক অন্যান্য ক্ষতিতো আছেই।

আবার ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে ভারত, পাকিস্তান দুটো রাষ্ট্রই ব্যাপক সমরাস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ যুদ্ধ বিমান এবং ট্যাঙ্ক নির্ভর হয়ে পড়ে। এ যুদ্ধে দুই পক্ষ ক্ষয়-ক্ষতির ভিন্ন ভিন্ন দাবি করলেও সাধারণ মতে এ যুদ্ধে ভারতের সৈন্য নিহত হয় ৩০০০ জন আর পাকিস্তানের নিহত হয় ৩৮০০ জন। ভারতের ট্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত বা বিনষ্ট হয় ১৫০-১৯০ টি আর পাকিস্তানের ট্যাঙ্ক বিনষ্ট হয় ২০০-৩০০ টি। ভারত বিমান হারায় ৬০-৭৫ টি আর পাকিস্তান হারায় অন্তত ২০টি। ভারত ভূমি হারায় ৫৪০ বর্গকিমি এবং পাকিস্তান হারায় ১৮৪০ বর্গকিমি। এ যুদ্ধে দুই পক্ষই নিজেদেরকে বিজয়ী দাবি করে।

১৯৭১ সালের যুদ্ধে বাংলাদেশের প্রায় ত্রিশ লাখ সাধারণ মানুষ নিহত হয়। ধর্ষিত হয় প্রায় ২-৪ লাখ নারী। উদ্বাস্তু ও শরণার্থী হয়ে ভারতে আশ্রয় নেয় ৮০ লাখ থেকে ১ কোটি মানুষ। অন্যদিকে ভারতের সৈন্য মারা যায় ৩৮৪৩ জন আর পাকিস্তানের সৈন্য মারা যায় ৯০০০ জন। আহতের সংখ্যা যথাক্রমে ৯৮৫১ ও ৪৩৫০। আর পাকিস্তানি আত্মসমর্পণকৃত সৈন্যের সংখ্যা প্রায় ৯৩ হাজার। ভারত হারায় ১ টি ফ্রিগেট, ১ টি নেভাল এয়ারক্রাফট, বিমান হারায় পাকিস্তানি দাবি অনুযায়ী ১৩০ টি আর ভারতের দাবি অনুযায়ী ৪৫ টি। অন্যদিকে পাকিস্তান হারায় ২ টি ডেস্ট্রয়ার, ১ টি মাইন্সউইপার, ১টি সাবমেরিন, ৩ টি প্যাট্রোল ভ্যাসেল, ৭টি গানবোট এবং পাকিস্তানের দাবি অনুযায়ী ৪২ টি যুদ্ধবিমান যা ভারতের দাবি অনুযায়ী ৯৪।

১৯৯৯ সালে কারগিল যুদ্ধে ভারতের পক্ষে মারা যায় ৫২৭ জন এবং পাকিস্তানের ৩৫৭-৪৫৩ জন। আহতের সংখ্যা যথাক্রমে ১৩৬৩ এবং ৬৬৫ এর বেশি। এতে ভারতের একটি যুদ্ধবিমান, ১টি হেলিকপ্টার ভূ-পাতিত, এবং একটি বিধ্বস্ত হয়।

সার্বিক দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় দুটো দেশ এ পর্যন্ত যুদ্ধ করে বহু হতাহত হয়েছে, যুদ্ধাস্ত্র হারিয়েছে। আর অন্যদিকে অস্ত্র প্রতিযোগিতা, সম্পর্ক খারাপ হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি তো রয়েছেই।

তবে সবচেয়ে আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে- বর্তমানে দুটো দেশই পারমাণবিক শক্তির অধিকারী। যুদ্ধ ব্যাপকহারে বেঁধে গেলে একে অপরের বিরুদ্ধে এই অস্ত্রগুলো যে কোনো সময় ব্যবহার হতে পারে। পারস্পরিক হুমকি-ধামকির মাধ্যমে তারা এ অস্ত্র ব্যবহারের কথা ইতোমধ্যে প্রকাশ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি খবর থেকে জানা গেছে, পাকিস্তানের কাছে থাকা ১৩০টি পরমাণু বোমার সবগুলিই ভারতের দিকে তাক করে মোতায়েন করে রাখা হয়েছে। মার্কিন কংগ্রেসে পেশ করা এক চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদনে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এবেলার প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

মার্কিন কংগ্রেসের স্বায়ত্তশাসিত শাখা কংগ্রেশনাল রিসার্চ সার্ভিস, সিআরএসের প্রতিবেদনে বলা হয়, পাকিস্তানের অস্ত্রাগারে থাকা ১১০ থেকে ১৩০টি পরমাণু বোমা সবক'টিই যেকোনো মুহূর্তে ব্যবহারের জন্য তৈরি। পাকিস্তান যে সব সময়ই পরমাণু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, সেটাই প্রমাণ করে এই প্রস্তুতি। অন্যদিকে পাকিস্তানের মোকাবেলায় ভারতও নিজেদের পরমাণু বোমার সংখ্যা বাড়াচ্ছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

অনেক বিশেষজ্ঞের মতে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আবহ তৈরি হলে তার আঁচ বাংলাদেশের গায়ে পড়বে সবচেয়ে বেশি। যেমন নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙে যাওয়া পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে প্রভাব ফেলেছিল সবচেয়ে বেশি। বিশ্বের এক প্রান্তের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলাফল দ্রুত অন্য প্রত্যন্তপ্রান্তেও সিদ্ধান্ত বদলে ভূমিকা রাখে। অথবা বিশ্ব রাজনীতির চরিত্রই দাঁড়িয়ে গেছে এমন যে, মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা কেবল মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক থাকছে না। মোদ্দাকথা পৃথিবীর যে কোনো দেশে যুদ্ধের জন্য কোনো উত্তেজনা তৈরি হলে তাতে জড়িয়ে পড়ছে গোটা বিশ্ব। যে কারণে সিরিয়ার সমস্যা কেবল সিরিয়ার মধ্যে থাকেনি, সেই একই কারণে

কাশ্মীরকেন্দ্রিক ভারতের সমস্যাও কেবল ভারতের মধ্যেই সীমিত থাকবে না। পারমাণবিক যুদ্ধ বাধলে বিশ্বে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। এতে অন্তত ২০০ কোটি মানুষের মৃত্যু হতে পারে। প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে মানবসভ্যতা। সাম্প্রতিক নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী ইন্টারন্যাশনাল ফিজিশিয়ানস ফর দ্য প্রিভেনশন অব নিউক্লিয়ার ওয়্যার এবং ফিজিশিয়ানস ফর সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি এই দুটি সংগঠন প্রকাশিত গবেষণামূলক এক প্রতিবেদনে এই আশঙ্কার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ওই দুই দেশের মধ্যে সীমিত পর্যায়েও পারমাণবিক অস্ত্রের লড়াই হলে বিশ্বের আবহাওয়ামণ্ডলের ব্যাপক ক্ষতি ও শস্যক্ষেত্র ধ্বংস হবে। পরিণামে খাদ্যপণ্যের বিশ্ববাজারে বহু গুণ খারাপ প্রভাব পড়বে। খাদ্যশৃঙ্খলায় দেখা দেবে বিশৃঙ্খলা।

এ অবস্থায় যদি সত্যিই এ অঞ্চলে একটি যুদ্ধ বাধে, তাহলে প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের বাংলাদেশ- এতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং এরকম একটি ভয়ানক পরিস্থিতিতে আমাদেরকেও সচেতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। কিন্তু সে বাধ্যবাধকতা কয়জন অনুধাবন করছেন তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। এ সময়টি রাজনৈতিক দলাদলি-কোন্দল, বিদেশমুখিতার সময় নয়। এখন দরকার ছিল প্রবল জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আসন্ন যে কোনো পরিস্থিতিতে দেশের ১৬ কোটি মানুষ যাতে নিরাপদে থাকে সে পদক্ষেপ নেওয়া। অন্যথায় গত ৪৫ বছর যাবৎ তিলে তিলে গড়ে ওঠা এই দেশটিও ভীষণ হুমকির মুখে পড়বে। সুতরাং যে করেই হোক এই সবুজ ভূখণ্ডটিকে রক্ষা করতেই হবে। সাধারণ মানুষকে কেবল চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য আর ক্ষেত-খামার নিয়ে ব্যস্ত থাকলে চলবে না, চারদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে, সজাগ-সচেতন থাকতে হবে। সরকার জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যেমন সোচ্চার, সজাগ ঠিক তেমনি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ব্যাপারেও সরকারকে সচেতন হতে হবে। আর পার্শ্ববর্তী দু'টি দেশের অভন্তরীণ বিষয়ে প্রতিবেশী দেশ হিসাবে আমাদের নিরপেক্ষ থাকা উচিত, কোনোভাবেই যেন এ যুদ্ধে আমাদেরকে কেউ জড়াতে না পারে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্যচেতনা সৃষ্টি করতে হবে। সঙ্কটকালে ঐক্যই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে। ১৬ কোটি মানুষকে যদি ঐক্যবদ্ধ করা যায় তবে যে কোনো পরিস্থিতি আমরা মোকাবেল করতে পারব। অভ্যন্তরীণ বাদ-বিবাদ থাকতে পারে, কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে বন্যা আসলে সাপ-বেজিরও বন্ধুত্ব হয়। আমরা তো আর সাপ-বেজি নই, আমরা হলাম আশরাফুল মাখলুকাত। তবে আমরা কেন দেশের স্বার্থে ক্ষুদ্র বিদ্বেষ পরিহার করতে পারব না?

ভারত-পাকিস্তানের সামরিক শক্তির তুলনামূলক চিত্র

	ভারত	পাকিস্তান
সক্রিয় সামরিক সদস্য	১৩,২৫,০০০	৬,২০,০০০
রিজার্ভ সদস্য	২১,৪৩,০০০	৫,১৫,০০০
বিমান	২০৮৬	৯২৩
হেলিকপ্টার	৬৪৬	৩০৬
ব্যবহার উপযোগী বিমানবন্দর	৩৪৬	১৫১
ট্যাংক	৬৪৬৪	২৯২৪
সাঁজোয়াযান	৬৭০৪	২৮২৮
সেল্ফ প্রপেল্ডগান	২৯০	৪৬৫
মাল্টিপল লঞ্চ রকেট সিস্টেম	২৯২	১৩৪
সামরিক নৌযান	২৯৫	১৯৭
সাবমেরিন	১৪	৫
বিমানবাহী রণতরী	২	০

সূত্র- গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার

ধর্ম কী?

রাকীব আল হাসান

ধর্ম শব্দটি পবিত্র কোর'আনে নেই, ওখানে দীনুল হক শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে (ফাতাহ্-২৮)। এর অর্থ সত্য জীবনব্যবস্থা। যে দীন বা জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করলে সমাজে সত্য ও ন্যায় স্থাপিত হবে, মানুষগুলো সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ হবে। একইভাবে ধর্মকে ধারণ করলে সমাজে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

সন্তান যদি মায়ের কাছ থেকে অনেক দূরেও থাকে তবু তার বিপদ হলে মায়ের মন ছটফট করতে থাকে। ছেলে-মেয়ে অসুস্থ হলে বাবা-মায়ের সারারাত ঘুম আসে না, বাবা ছুটাছুটি করতে থাকেন ছেলেকে সুস্থ করার প্রচেষ্টায়, মা সারারাত জেগে সন্তানের সেবা-সুশ্রুষা করেন। এর কারণ হলো সন্তানের সাথে মা-বাবার আত্মা এক অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা থাকে।

এই যে সন্তানের জন্য মায়ের আত্মার টান, সন্তানের কষ্টে মায়ের মন অশান্ত হওয়া, সন্তানের সুখে নিজেও আনন্দিত হওয়া- এটা হলো তার মাতৃধর্ম। একইভাবে সন্তানের জন্য পিতার যে অনুভূতি তা হলো পিতৃধর্ম। আর সন্তান যখন কষ্টে থাকে তখন তার কষ্ট দূর করার যে প্রচেষ্টা তা হলো পিতা-মতার (ঐ ধর্মের) ইবাদত বা কর্তব্য। একইভাবে সন্তান হিসাবে পিতা-মাতার প্রতি যে কর্তব্য তা সন্তানের জন্যও ইবাদত।

প্রতিটা মানুষের মধ্যে আল্লাহর রূহ রয়েছে, এ কারণে প্রতিটা মানুষের সাথে প্রতিটা মানুষের আত্মাও এক অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা থাকে। যখন পৃথিবীর অপর প্রান্তে একটা মানুষ কষ্টে থাকবে তখন এ প্রান্তে বসবাসকারী মানুষের আত্মাও কষ্ট অনুভব করবে আর তার কষ্ট দূর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে- এটাই হলো মনুষ্য ধর্ম। মানুষের মধ্যে যখন এই ধর্মটি পূর্ণরূপে জাগ্রত থাকে তখন সমাজ শান্তিতে পূর্ণ হয়ে যায়, এই শান্তিপূর্ণ সমাজই হলো ইসলামী সমাজ। যুগে যুগে সকল ধর্মের নামই ইসলাম ছিল আর ধর্মগুলোর মূল লক্ষ্যই ছিল মানুষের এই মনুষ্য ধর্মকে জাগ্রত করে সমাজকে শান্তিপূর্ণ করা। উদ্দেশ্য পূরণের প্রক্রিয়া কেবল স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। কিন্তু সব ধর্মের লক্ষ্য একটিই- সমাজকে শান্তিপূর্ণ করা, মানুষের মনুষ্য ধর্মকে জাগ্রত করা। এজন্যই ধর্মের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে- গুণ, বৈশিষ্ট্য, চরিত্র। যে গুণ, বৈশিষ্ট্য ধারণ করলে কোনো বস্তুর স্বকীয়তা বজায় থাকে সেটিই হলো তার ধর্ম। আগুনের ধর্ম পোড়ানো, চুম্বকের ধর্ম আকর্ষণ করা। ঠিক একইভাবে মানুষের প্রকৃত ধর্ম হলো অন্য মানুষের দুঃখ, কষ্ট হৃদয়ে ধারণ করা অর্থাৎ মানবতা। এজন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সকল দীনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের শান্তি (ইসলাম)।

আজকে ধর্মগুলোর মূল লক্ষ্য পাল্টে গেছে। কিছু প্রথা আর আনুষ্ঠানিকতায় বাঁধা পড়েছে ধর্মগুলো। মনে করা হচ্ছে ধর্ম দুনিয়ার কোনো বিষয় নয়, বরং মৃত্যুর পরের জীবনের মুক্তির পন্থা। এ কারণে মানবসমাজ আজ অন্যায়-অবিচার, যুলুম-নির্যাতনে পরিপূর্ণ, শোষিত-বঞ্চিত জনতা ত্রাহী সুরে চিৎকার করছে, নিরপরাধ শিশু, অসহায় নারীর হৃদয়বিদারী চিৎকারে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে তবু আমাদের সমাজের ধার্মিকরা ব্যস্ত আছে কেবল সওয়াব কামানোর নেশায়, নিজেরা-নিজেরা দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত আছে কেবল ধর্মীয় প্রথা-অনুষ্ঠানের মতপার্থক্য নিয়ে, শরীয়তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে।

যতদিন মানুষ ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য না জানতে পারবে ততদিন তাদের মধ্যে বিরাজিত বিরোধ মিটিয়ে সত্যিকারের ইসলামী সমাজ তথা শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানো সম্ভব হবে না।

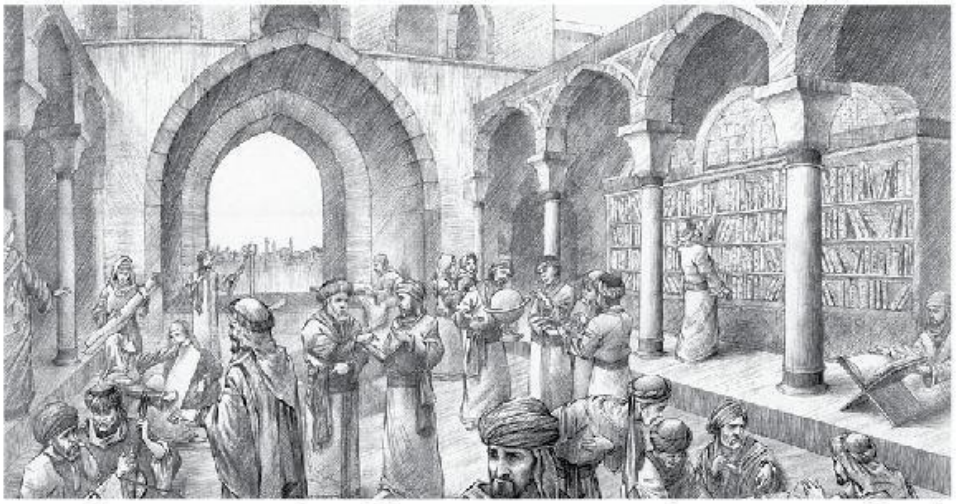

মানুষের জীবন যখন অন্যায়, অবিচার, নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা আর দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত সেই মুহূর্তে রসুল (সা.) এর আগমন মানুষকে মুক্তির সন্ধান দিতে পেরেছিল। সমাজে ন্যায়, শান্তি, সুবিচার, নিরাপত্তা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি এমনভাবে শুরু হয়েছিল যে সেটা দেখেই কোটি কোটি মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলামকে বরণ করে নিয়েছিল।

ইসলাম কীভাবে মানুষের হৃদয় জয় করেছিল?

মোহাম্মদ আসাদ আলী

আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে আল্লাহর রসুল (সা.) যখন পৃথিবীতে ইসলাম প্রচার শুরু করলেন, প্রথমে তাকে মানুষ ভুল বুঝালো, ধর্মব্যবসায়ী ও কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের অপপ্রচারে সাধারণ মানুষ প্রভাবিত হলো, অত্যাচারে অত্যাচারে মহানবীকে (সা.) জর্জরিত করল কিন্তু কঠর অধ্যবসায়, পাহাড়সম সবর, নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যখন রসুল (সা.) বিজয়ী হলেন তখন দেখা গেল লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। ইসলামের আদর্শ ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। এশিয়া থেকে আফ্রিকা, আফ্রিকা থেকে ইউরোপ, সর্বত্রই ইসলামের একটা জয়জয়কার পড়ে গেল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, মুসলমানদের ঘোর শত্রুও ইসলামের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো এই দীনকে গ্রহণ করে নিচ্ছিল। অল্প দিনের মধ্যে আদর্শ হিসেবে ইসলামের এমন যুগান্তকারী উত্থান ঘটল যার সম্মুখে সমসাময়িক সকল আদর্শ, সকল মতবাদ আবেদন হারিয়ে বর্ণহীন হয়ে গেল।

ইসলামের প্রতি মানুষের এই অভাবনীয় আকর্ষণের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে-

১। ইসলাম অনৈক্য-হানাহানিতে লিপ্ত দাঙ্গাবাজ আরবদেরকে ঐক্যবদ্ধ সুশৃঙ্খল সুসভ্য জাতিতে পরিণত করতে পেরেছিল।

২। বংশানুক্রমিক শত্রুতা আর রক্তপাতে নিমজ্জিত আরব জাতিকে একে অপরের ভাই বানিয়ে দিয়েছিল।

৩। আরব-অনারব, আশরাফ-আতরাফ, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-নিরক্ষরের আকাশ-পাতাল মর্যাদার ব্যবধান দূর করতে পেরেছিল।

৪। যে সমাজে দাসদেরকে মানুষ মনে করা হত না, ক্রীতদাসকে আপন পুত্র ঘোষণা দিয়ে তাঁকে সেনাপ্রধান বানানো তৎকালীন জাহেলী সমাজে কল্পনাতীত কিন্তু রসুলাল্লাহ (সা.) তা-ই করেছেন। এছাড়াও তিনি সেই সমাজের ক্রীতদাস বেলালকে (রা.) কাবার উর্ধ্বে উঠিয়ে (মক্কা বিজয়ের পর) আল্লাহর রসুল বুঝিয়ে দিলেন- সবার উর্ধ্বে মানুষ, সবার উপরে মানবতার স্থান। আল্লাহর কাছে একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষের মূল্য তাঁর কাবার চেয়েও অধিক। ইসলামের এই সাম্যবাদী আদর্শ লক্ষ লক্ষ বেলালদের অন্তরে মুক্তির তুফান সৃষ্টি করেছিল, ইসলামকেই তারা মুক্তির পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৪। ইসলাম সাম্প্রদায়িক বিভাজনের গালে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করে যা ওই সমকালীন বিশ্বে কল্পনাও করা যেত না। সকল ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-বংশের মানুষ নিয়ে মদীনায় 'ঐক্যবদ্ধ জাতি' গঠন করে আল্লাহর রসুল প্রমাণ করে দেন- 'ইসলামে বিভক্তি নয়, ঐক্যই মূল শিক্ষা। কে কোন ধর্মের, কে কোন বর্ণের, কে কোন গোত্রের- তা দিয়ে মানুষের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পায় না। যে ব্যক্তি ন্যায় ও সত্যকে ধারণ করবে ইসলাম তাকেই আলিঙ্গন করবে।' ফলে ইসলামের এই সার্বজনীনতার কাছে অন্য সব আদর্শ ম্রীয়মান হয়ে পড়ে।

৫। নির্যাতিত, নিপীড়িত, শোষিত মানুষ, যারা বেঁচে

থাকত রাজা-বাদশাহ, যাজক-পুরোহিত আর সমাজপতিদের কৃপাগুণে, সমাজে যাদের ন্যূনতম অধিকার ছিল না, সম্মান ছিল না, যাদের মাথাকাটা যাবার জন্য সমাজপতিদের একটি সিদ্ধান্তই যথেষ্ট ছিল, সেই মানুষগুলো ইসলামের ন্যায়বিচার দেখে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। যে সম্মান তারা কল্পনাও করতে পারত না ইসলাম তাদেরকে তার চেয়েও অধিক সম্মান দিয়েছে। ওই দাসশ্রেণির মানুষই তাদের 'আমীরুল মু'মিনিনের' গায়ের জামা কীভাবে বানানো হলো তার কৈফিয়ত চেয়েছে, জনসম্মুখে জবাব দিতে হয়েছে অর্ধ-পৃথিবীর শাসককে। এমন দৃষ্টান্ত আজকের যুগেও কল্পনা করা যায়?

৬। ইসলাম ক্ষুধার্তকে খাদ্য দিয়েছে, বাস্তহারাকে বাস্ত দিয়েছে। কে কোথায় কী সমস্যায় পড়ে আছে তার সমাধান করার জন্য রাতের আঁধারে রাস্তাঘাটে, অলি-গলিতে হেঁটেছেন ইসলামের খলিফা, অর্ধপৃথিবীর শাসনকর্তা। ক্ষুধার্ত মানুষের বাড়িতে নিজের কাঁধে করে আটার বস্তা পৌঁছে দিয়েছে।

৭। যে নারীদের মানুষ হিসাবেই গণ্য করা হতো না, কন্যা সন্তানকে শুধু মেয়ে হওয়ার অপরাধে জীবন্ত জীবন্ত কবর দেওয়া হতো সেই নারী জাতিকে সেনাবাহিনী, বাজারব্যবস্থা, চিকিৎসা, শিল্প, কৃষিসহ রাষ্ট্রীয় সকল কাজে অংশ গ্রহণের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল আল্লাহ রসুলের ইসলাম। শুধু তাই নয় এমন নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছিল যে, একা একটা সুন্দরী যুবতী সারা গায়ে স্বর্ণালংকার পরিহিত অবস্থায় শত শত মাইল হেঁটে যেত তবু তার মনে আল্লাহ ও বন্য জন্তু ছাড়া কোনো ভয় থাকত না।

৮। যখন সারা বিশ্বে শক্তিমানের কথাকেই আইন ভাবা হচ্ছিল, বিরাট-বিরাট অট্টালিকায়, মনি-মুক্তাখচিত রাজপ্রাসাদে অস্বাভাবিক ভোগ-বিলাসিতার মধ্যে বসবাসরত 'সম্রাট'দের কাছে নিজেদের ফরিয়াদ জানানো তো দূরের কথা, তাদেরকে এক পলক দেখারও সৌভাগ্য ছিল না সাধারণ মানুষের, সেই সময়েই ইসলামী আদর্শ এমন একটি সমাজ নির্মাণ করে, এমন সুবিচার ও স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে যে, অর্ধপৃথিবীর শাসক একটি খেজুরপাতার ছাউনি দেয়া মসজিদে বসে রাজ্য শাসন করতেন। যার আবার একটির বেশি জামা ছিল না। তিনি তটস্থ থাকতেন তার শাসনের অধীনে কেউ কোথাও কষ্ট পাচ্ছে কিনা, একটি কুকুরও না খেয়ে থাকছে কিনা সেই দুশ্চিন্তায়। ঘুম এলে গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়তেন। যার যখন ইচ্ছা খলিফার সাথে দেখা করতে পারত, সমস্যা বলত, সমাধান হয়ে যেত।

মূল কথা হচ্ছে ইসলাম মানুষের 'বাস্তব সমস্যার' বাস্তব সমাধান করতে পেরেছিল। যখন মানুষের সমস্যা ছিল অধিকারহীনতা, অন্যায়, অবিচার, নির্যাতন, স্বাধীনতাহরণ, শোষণ, বঞ্চনা, দারিদ্র্য; তখন ইসলাম মানুষকে মুক্তির সন্ধান দিতে পেরেছিল। প্রতিষ্ঠা করেছিল ন্যায়, শান্তি, সুবিচার ও নিরাপত্তা। ওই ন্যায় ও শান্তি দেখেই কোটি কোটি মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। পরকালীন মুক্তির ব্যাপারও ছিল, তবে মুখ্য বিষয় ছিল মানুষের পার্থিব মুক্তি। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, বাস্তব সমস্যার বাস্তব সমাধান করত যে দীন, সেই দীন আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আজ আমাদের ইসলাম অন্য ইসলাম। এই ইসলাম পালন করে মিনিটে মিনিটে লক্ষ-কোটি নেকি কামাই করা যায়, অন্যায়-অবিচারের কষাঘাতে জর্জরিত দুঃখ-কষ্টে ভারাক্রান্ত মানুষকে জান্নাতের আশ্বাস দিয়ে আত্মিক প্রশান্তিও প্রদান করা যায়, কিন্তু যেহেতু এ ইসলাম মানুষের বাস্তব সমস্যার বাস্তব সমাধান করতে ব্যর্থ হচ্ছে, যেহেতু এ ইসলাম ইহজাগতিক বিষয়কে এড়িয়ে নিছক পারলৌকিক মুক্তির উপায় হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে সুতরাং স্বভাবতই সে তার আকর্ষণক্ষমতা হারিয়েছে। আদর্শ হিসেবে ইসলামের আবেদন হারিয়ে যাওয়ার এটাই প্রধান কারণ। আজকে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া ছেলে-মেয়েদেরও ঘোর ইসলামবিদ্বেষী হতে দেখা যাচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে, আমরা কখনও খতিয়ে দেখেছি?

এদিকে সাধারণ মানুষ এখন পশ্চিমা বাদ-মতবাদগুলোকে আলিঙ্গন করে নিয়েছে। এসব তন্ত্র-মন্ত্র মানুষের প্রকৃত শান্তি নিশ্চিত করতে পারুক বা না পারুক, এদের কিছু বাণী আছে, কিছু মূল্যবোধ আছে, কিছু আশ্বাস আছে যা মানুষকে মুক্তির মরিচীকা দেখিয়ে টেনে রাখতে পারে। অন্যদিকে ধর্মের অবস্থা বড়ই সঙ্গীন। কারণ, আমাদের আলেমরা (ব্যতিক্রম কিছু বাদে), আমাদের ধর্মজ্ঞানী পণ্ডিতরা দেশ-কাল-সমাজ নিয়ে ভাবনাকে মনে করেন 'দুনিয়াদারী'। সাধারণ মানুষকেও তাই শেখানো হয়। মানুষকে বোঝানো হয় পৃথিবীর জীবন তুচ্ছ বিষয়, পরকালের জীবনটাই আসল জীবন। ওই জীবনের জন্য রসদ সংগ্রহ কর, যত পার নেকি কামাও, দুনিয়াতে কী হচ্ছে না হচ্ছে ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট কর না। দুনিয়া শয়তানের, পরকাল মু'মিনদের। এর ফলে যারা পরকাল নিয়ে ভাবছে, অর্থাৎ ধার্মিক শ্রেণি, তারা পৃথিবীর অন্যায়, অবিচার দেখেও নিশ্চুপ থাকছে। অপরদিকে যারা পৃথিবীর অন্যায়, অবিচার দেখে ব্যথিত হয়, মানুষের মুক্তির জন্য কিছু করতে চায়, তারা ধর্মের প্রতি আকর্ষণ হারাচ্ছে। ক্ষেত্রবিশেষে ধর্মবিদ্বেষী হয়ে যাচ্ছে।

এই যে আল্লাহ-রসুলের ইহকাল-পরকালের ভারসাম্যপূর্ণ দীনকে ভারসাম্যহীন করে ফেলা এবং তার পরিণতিতে যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ রসুলকে পাঠিয়েছেন, যে উদ্দেশ্যে দীনুল হক্ব পাঠিয়েছেন সেই উদ্দেশ্যই অবাস্তবায়িত থেকে যাওয়া- এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। এখনও যদি আমরা ইসলামের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে না পারি, যদি গুরুত্বের অগ্রাধিকার বুঝতে ব্যর্থ হই, আমাদের কৃতকর্মের কারণে দুনিয়াতে ইসলাম কলঙ্কিত হয়, তাহলে হাশরের ময়দানে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কাছে কঠোর জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদেরকে বুঝতে হবে ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজাতিকে পৃথিবীতে ন্যায়, সুবিচার ও শান্তি দেওয়া এবং পরকালে জান্নাত দেওয়া। পৃথিবীকে অন্যায়-অসত্যের হাতে সোপর্দ করে যতই ধর্ম-কর্ম করা হোক তা এই দীনের স্রষ্টার কাছে গৃহীত হবে না।

আত্মসমালোচনা

ঐতিহাসিক ব্যর্থতার দায় বহন করছে মুসলিম জাতি

মনিরুয্যামান

যে ইসলাম আজ নানা প্রকার রূপ নিয়ে আমাদের ১৬০ কোটি মুসলমানের দ্বারা চর্চিত হচ্ছে তাকে আমরা বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা চেতনার যুগের উপযোগী করে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হচ্ছি। এ ব্যর্থতার কারণে ইসলাম এ যুগের চাহিদা ও যাবতীয় সমস্যার সমাধানরূপে মানবজাতির দ্বারা বিবেচিত হতে পারছে না। ইসলামের যারা ধারক বাহক তারাও যুক্তির যুগে যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসকেই প্রাধান্য দিয়ে চলেছেন।

মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানুষ, সর্বোত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল (সা.) অক্লান্ত পরিশ্রম, কঠোর অধ্যবসায়, ত্যাগ, কোরবানি, তুলনাহীন প্রেরণা দিয়ে এই উম্মতে মোহাম্মদী জাতিটিকে কেন গঠন করেছিলেন তা এখন এ জাতির অজানা। তাদের স্মৃতি ও অবদান ম্লান হতে হতে জাতির চোখের সামনে থেকে অদৃশ্যই হয়ে গেছে। প্রখর রৌদ্রে জ্বলেপুড়ে টকটকে লাল পোশাক যেমন ফিকে হয়ে যায় তেমনিভাবে উম্মতে মোহাম্মদীর ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে গেছে, তার গৌরবগাঁথা সকলেই বিস্মৃত হয়ে গেছে। শত শত বছর থেকে জাতি মার খেতে খেতে হীনম্মন্যতায় আপ্লুত, তাদের দৃষ্টি ও শির অবনত। আমি কোর'আনের একটি আয়াত উল্লেখ করে জাতি সৃষ্টির কারণটি তুলে ধরছি। আল্লাহ সুরা ইমরানের ১১০ নম্বর আয়াতে বলছেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে এ জন্য যে তোমরা মানুষকে ন্যায়ের আদেশ করবে এবং অন্যায় থেকে ফেরাবে।" সুতরাং যতদিন পৃথিবীতে অন্যায় অবিচার থাকবে ততদিন মুসলিম জাতির দায়িত্ব থাকবে সেই অন্যায়কে নিবারণ করা এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা। অতীতে যত নবী রসুল অবতার এসেছেন তাদের সবারই জাতি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল এটিই, দুষ্টের দমন-শিষ্টের লালন (আমরু বিল মা'রুফ ওয়া নেহি আনিল মুনকার)। আল্লাহর রসুলের তিরোধানের ৬০/৭০ বছর পর মুসলিম জাতি উদ্দেশ্য ভুলে যাওয়ার দরুন এ দায়িত্বটি ত্যাগ করে। তাদের সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম রূপ নেয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে। মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর জিম্মাদার খলিফা হয়ে যান ভোগবিলাসে, সুরা (মদ), নারীতে মত্ত সম্রাট, সুলতান, কেসরা, কায়সার। জাতির আলেমরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোর'আন হাদীসের উপর ইজতেহাদ করে ইজমা, কিয়াস করে হাজার হাজার মাসলা মাসায়েল উদ্ভাবন করতে লাগলেন। এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের তারতম্যের দরুন উম্মাহ বিভিন্ন পণ্ডিত ও বুজুর্গ(!) ব্যক্তির মতাদর্শকে অনুসরণ করে শত শত ফেরকা মাজহাবে ভাগ হয়ে গেল।

অন্যদিকে পারস্য থেকে প্রবেশ করা ও পূর্বতন ধর্মের বিকৃত সুফিবাদের প্রভাবে মানবজাতির জীবন থেকে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মানসিকতা সম্পূর্ণ ত্যাগ করে সংগ্রামবিমুখ, অন্তর্মুখী, ঘরমুখী সুফিসাধক, ভারসাম্যহীন দরবেশ ও বুজুর্গে পরিণত হলো একেকজন। তাদের উদ্ভাবিত তরিকার অনুসরণ করতে গিয়ে জাতি আরো শত শত তরিকায় বিভক্ত হয়ে গেল। ফলে একদেহ একপ্রাণ হয়ে এক নেতার নেতৃত্বে এই জাতি পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে গিয়ে সেখানকার অসহায় মানুষকে রক্ষা করার প্রেরণা, লক্ষ্য (আকিদা) ও সামর্থ্য সবই হারিয়ে ফেলল।

মধ্যযুগের বর্বর ইউরোপে মানুষ যখন যাজকতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের যাঁতাকলে পড়ে মুক্তির জন্য ত্রাহিসুরে চিৎকার করেছে, তখন সময়ের দাবি পূরণ করতে জন্ম নিয়েছে ইউরোপীয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (প্রকৃতপক্ষে ধর্মহীনতাবাদ) যা বিবর্তনের মাধ্যমে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল মানুষের তৈরি করে নেওয়া পুঁজিবাদী গণতন্ত্র মানুষকে শান্তি দিতে পারছে না। কয়েকশ বছর যেতেই আবারো মানুষ পাগল হয়ে উঠল উপনিবেশবাদ ও পুঁজিবাদের শোষণ বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য।

সময়ের দাবিতে জন্ম নিল সাম্যবাদ। লক্ষ কোটি মানুষ পাগলপারা হয়ে, হাজার হাজার মানুষ জীবন দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল। কিন্তু তারাও মুক্তি পায় নি। সমাজতন্ত্র এক শতাব্দীও টিকল না, চরম ফ্যাসিস্ট রূপ নিয়ে আবারও মানুষকে অশান্তির দাবানলে নিক্ষেপ করল। গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-ফ্যাসিবাদ মিলে দুই-দুইটি বিশ্বযুদ্ধ করল, শত শত নগর, সভ্যতা ধ্বংস করল, ১৪ কোটি বনি-আদম খুন হলো, বহুগুণ আহত ও বিকলাঙ্গ হলো। মানুষ এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল এবং আবার পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের দিকেই ফিরে গেল। যেসব দেশে এখনও নামেমাত্র সমাজতন্ত্র আছে তারা বাস্তবে ঘোর

পুঁজিবাদী।

ইসলামেরই অঙ্গীকার ছিল মানবজাতির জীবন থেকে সকল অন্যায় অশান্তি দূর করার। তখন যদি মুসলিমরা আল্লাহর রসুলের (সা.) রেখে যাওয়া সেই সাম্য, মৈত্র ও ভ্রাতৃত্বের বাণী নিয়ে যেখানে মানবতা ভূলুণ্ঠিত সেখানে যেত তবে ঐ নিপীড়িত মানুষগুলে হয়তো নানাবিধ মতবাদ গ্রহণ করে অশান্তির আগুনে জ্বলত না, তারা প্রকৃতই মুক্তির পথটি পেয়ে যেত। সেই ইসলাম এখন কেবলই আখেরাতে জাহান্নামের মুক্তির পথ দেখাতে উদগ্রীব। কোন আমলে কত সওয়াব এর গবেষণাতেই ধার্মিকেরা ব্যস্ত। যে ইসলাম খোদ মুসলমানকেই দুনিয়াতে শান্তি দিতে পারল না, সেটা আখেরাতে কী করে জান্নাত দেবে - এ প্রশ্ন করা হলে প্রশ্নকারীর কপালে জুটবে কাফের, মুরতাদ, খ্রিষ্টান ফতোয়া। আদর্শিক সংকটের সময়গুলোতে ইসলামকে মানবজাতির মুক্তির জন্য উপযোগী আদর্শ হিসাবে প্রাণবন্ত, গ্রহণযোগ্য ও আধুনিক রূপে উপস্থাপন করার দায়িত্ব ছিল উম্মাহর আলেম সমাজের। সেটা করতে তারা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন বলেই হয়ত মানুষকে নতুন নতুন জীবনব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হয়েছে। তারা ইসলামটাকে শুধু ব্যক্তিগত সওয়াবের ধর্মে পরিণত করে মসজিদে খানকায় ঢুকেছেন এবং সেখানে বসে ধর্ম বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করছেন।

দিন পাল্টাচ্ছে। চিন্তা চেতনার অগ্রগতি ও প্রগতির যুগে মানুষ আর সওয়াবের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে না। কারণ সওয়াব তাদেরকে বাস্তব সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারছে না। আমরা ইতিহাসে দেখি ১৪০০ বছর আগে আল্লাহ রসুল যে দীন নিয়ে আসেন তখন কিন্তু আরবের লোকেরা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত, লাঞ্ছিত, পশ্চাৎপদ, দরিদ্র জাতি ছিল। আল্লাহর রসুল তাদের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করেছিলেন। তাদের ঘরে খাবার ছিল না। তিনি তাদেরকে বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত করলেন। তাদের সমাজে নিরাপত্তা ছিল না, তিনি অকল্পনীয় নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিশ্বের দরবারে তাদের কোনও সম্মান ছিল না, তাদেরকে সম্মানিত জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না, তিনি তাদেরকে ভাই বানিয়ে দিয়েছেন। দাসব্যবসার যুগে তিনি বেলালকে (রা.) কাবার ঊর্ধ্বে উঠিয়েছিলেন, মুক্তদাস যায়েদকে (রা.) পুত্র বানিয়েছিলেন এবং বহু সামরিক অভিযানের সেনাপতি করেছিলেন। ইসলামপূর্ব যুগে নারীদের কোনো মর্যাদা ছিল না। মেয়ে সন্তানকে জীবিত কবর দিত অনেকেই। সেই নারীদেরকে ইসলাম সামষ্টিক জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে সম্মানজনক অবস্থান ও ন্যায়সঙ্গত মর্যাদার আসন দান করেছে।

অর্থাৎ ইসলাম ঐ সমাজের বাস্তব সমস্যার বাস্তব সমাধান দিয়েছিল বলেই তা ঐ সময়ের মানুষের জীবনে ও মননে গৃহীত হয়েছিল। যেখানেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানেই মানুষ শান্তি, নিরাপত্তা, স্বচ্ছলতা, প্রগতি ও ন্যায়বিচার লাভ করেছিল। জাতি যেন আধ্যাত্মিক দিক থেকেও বলিষ্ঠ থাকে সে জন্য প্রতিটি ব্যক্তিগত কল্যাণময় কাজের বিপরীতে সওয়াবের ধারণাও প্রত্যেকের মনে বিরাজ করত। পেটে যখন খাবার না থাকে তখন পূর্ণিমার চাঁদকেও রুটি বলে ভ্রম হয়। সমাজে যখন নিরাপত্তা থাকে না তখন ধর্মকে মানুষের কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়, তখন নিজেকে রক্ষা, নিজের সম্পদ রক্ষা, দেশ রক্ষাই প্রধান ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়। দুঃখ, দুর্দশায় হতাশাগ্রস্ত মানুষকে সওয়াবের ওয়াজ আকৃষ্ট করে না। দোয়া-দরুদ, যিকির-আসকারের ওয়াজ তাদের হৃদয়ে কোনো আবেদন সৃষ্টি করে না। তথাপি সমাজের মধ্যে বিরাজকারী বিরাট একটি শ্রেণি যারা ধর্মকে জীবিকার মাধ্যমরূপে ব্যবহার করছেন তারা ধর্মকে ব্যক্তিগত উপাসনার ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে জিঁইয়ে রাখতে মরিয়া। এটা করার জন্য তারা সওয়াব ছাড়া অন্য কিছুর ভরসা, বিশেষ করে পার্থিব শান্তির ভরসা মানুষকে দিতে পারছেন না। এটাই হলো আলেমদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।

মহাসত্য হচ্ছে, শেষ দীন ইসলাম, যা বিশ্বের সমস্ত মানবজাতির মধ্যে একটা বিপ্লব সৃষ্টি করে দেয়ার মতো আদর্শ, মানুষকে মুক্তি দেওয়ার মতো একমাত্র দর্শন তা কস্মিনকালেও বসে বসে সওয়াব কামাইয়ের জন্য আসে নি। আলেমদের ব্যর্থতার দরুণ পকেটে হীরার খণ্ড থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরতে বাধ্য হচ্ছে মুসলিমরা। আর আমাদের মতো সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষদের বড় ব্যর্থতা হলো আমরা সমাজের যাবতীয় অন্যায়কে পাশ কাটিয়ে, মুখ বুজে সহ্য করে কোনোমতে নিজে খেয়ে পরে বেঁচে থাকাকেই যথেষ্ট মনে করছি। এদিকে আমাদের দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে যাক, ওটা রক্ষা করবে সরকার, আমাদের ধর্ম ধ্বংস হয়ে যাবে যাক - ওটা রক্ষা করবে আলেমরা, এমন বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে বসে আছি। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা ধর্ম সম্পর্কে জানব না, জান্নাতে যাওয়ার পথ আমাদেরকে আলেমরাই দেখাবেন। আমাদের এই স্থবিরতা, চিন্তার জড়তা, আত্মকেন্দ্রিকতাই আমাদের সব সর্বনাশের কারণ। এখন অন্যের সমালোচনা বাদ দিয়ে আত্মসমালোচনা করতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে কোথায় আমরা পথ হারিয়েছি। সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র ও জঙ্গিবাদীদের কাজের ফলে যে ভয়াবহ তাণ্ডব ধেয়ে আসছে এবং ঘরের পাশে বৈরী দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে যে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে তাতে আমরা যদি এখনই ঐক্যবদ্ধ না হই তবে আমাদের ধর্ম ও দেশ উভয়ই ধ্বংসের মুখে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না

মাতম করা নয় প্রয়োজন আত্মোপলব্ধি

কাজী আব্দুল্লাহ আল মাহফুজ

মহররম মাসের ১০ তারিখকে আশুরা বলে। সৃষ্টির শুরু থেকে এই দিনে মানবজাতির ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায়। এর মধ্যে সবগুলো ঘটনার সত্যাসত্যের ব্যাপারে সঠিক কোন তথ্য না থাকলেও যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে জানা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এই দিনে মহান আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, এই দিনই আসমান থেকে প্রথম রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এছাড়া এই দিনে পবিত্র কাবা ঘর নির্মাণ, আদম (আ.), মা হাওয়া (আ.), ইবরাহীম (আ.) ও জিবরাইল (আ.)সহ নৈকট্যপ্রাপ্ত মালায়েকদের সৃষ্টি করা, আদম (আ.) এর তওবা কবুল, আদম (আ.) এর জান্নাতে প্রবেশ, ইদ্রিস (আ.) কে অতি উচ্চ সম্মান প্রদান, নূহ (আ.) এর মহাপ্লাবন হতে নাজাত লাভ, ইবরাহীম (আ.) -কে নমরুদের আগুন থেকে নাজাত, ইউসুফ (আ.) এর পিতার সাথে মিলিত হওয়া, আইয়ুব (আ.)-এর কঠিন রোগ হতে নাজাত, ইউনুস (আ.) এর মাছের পেট থেকে উদ্ধার, আল্লাহর বিশেষ মো'জেজার মাধ্যমে মুসা (আ.) এর সাগর পাড়ি ও একই সাথে ফেরাউন এর পানিতে ডুবে মৃত্যু, কারবালার ময়দানে হুসাইন (রা.) এর স্বপরিবারে শাহাদাত বরণসহ এই দিন কেয়ামত সংঘটিত হবে বলেও উল্লেখিত রয়েছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মূলতঃ এই ঘটনাগুলোর জন্যই কিন্তু এই দিনটি পালিত হচ্ছে না। এই দিনটি পালন করা হয় ইসলামের ইতিহাসের একটি হৃদয়বিদারক ও দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। তাও সবাই নয়। বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পালন করে শুধু ইসলামের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাযহাব শিয়া সম্প্রদায়ের অনুসারীগণ। ইরানে এই দিনটি জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হয় এবং এ দিন সরকারি ছুটি থাকে। দিনটি পালন করতে গিয়ে তারা নানা আয়োজন করে থাকে। যেমন তাজিয়া মিছিল, মাতম ইত্যাদি। বাংলাদেশেও শিয়া সম্প্রদায় এ দিনটি পালন করে থাকে। পুরান ঢাকায় বিশেষ কিছু এলাকায় এসব অনুষ্ঠান পালিত হয়।

দিনটি মূলতঃ পালন করা হয় শোক প্রকাশের দিবস হিসেবে। দিবসটি ঠিক কবে থেকে পালন করা শুরু হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তবে এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে মুসলিম দুনিয়ার প্রায় সকলেই অবগত আছেন। সেটা হলো- কারবালার সেই মর্মান্তিক ঘটনা। এই দিনে রসুলাল্লাহর দৌহিত্র হুসাইন (রা.) ইয়াজীদের আনুগত্য না করে কারবালা প্রান্তরে ৪০ জন তরবারি চালাতে সক্ষম সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করে পুরো পরিবারসহ আত্মদান করেন। ইতিহাস রচনাকারীরা এই দিনের প্রত্যেকটি ঘটনাকে বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। এক ফোঁটা পানি না পেয়ে শিশুদের কলিজা ফেটে যাওয়ার বর্ণনাও আছে। অথচ উভয় দলই দাবি করত তারা মুসলিম। প্রশ্ন হলো জাতির মধ্যে কেন এই লজ্জাজনক ঘটনা ঘটল? এমন তো হওয়ার কথা ছিল না।

রসুলাল্লাহ (সা.) যখন আরবের বুকে আসলেন তখন আরবের অবস্থা কেমন ছিল তা আলাদা করে বলার দরকার পড়ে না। তারা তখন ছিল সকল দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ, বিশৃঙ্খল ও পৃথিবীর বুকে অবহেলিত একটি জাতি। পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা তাদের দিকে অবজ্ঞাভরে তাকাত। নিজেরা নিজেরা বছরের পর বছর গোত্রগত বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে যুদ্ধ চালিয়ে যেত। তাদের মধ্যে না ছিল শিক্ষা, না ছিল সম্পদ। প্রখর মরুর অনুর্বর মাটিতে খেজুর ছাড়া তেমন কোন ফসল জন্মাতো না। চিন্তা চেতনায়ও তারা ছিল নিম্ন পর্যায়ে। তারা কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দিত। পবিত্র কাবা ঘরে লাৎ, মানাত আর ওজ্জার মূর্তি তৈরি করে তাদের উপাসনা করত। এই যখন ছিল আরবের অবস্থা তখন রসুলাল্লাহ (সা.) তাদের সামনে আল্লাহর তরফ থেকে উপস্থাপন করলেন মুক্তির বাণী। তিনি মানুষকে ডাক দিলেন সব বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে নিতে। কিন্তু পথভ্রষ্ট আরবগণ তাঁর কথা তো মেনে নিলই না বরং তারা এই মহামানবের বিরোধিতা করে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করল। কিন্তু রসুলাল্লাহ (সা.) কঠোর সংগ্রাম আর অটল অধ্যবসায়ের মাধ্যমে, অসংখ্য প্রাণপ্রিয় অনুসারীদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বিজয় লাভ করে এমন একটি জাতি সৃষ্টি করলেন যে জাতির নাম উম্মতে মোহাম্মদী।

অল্প সময়ের ব্যবধানে এই জাতিটিই আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল। বিশৃঙ্খল এই জাতির মধ্যে ফিরে এল শৃঙ্খলা, ঐক্যহীনতার পরিবর্তে সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্য, মালায়েকদের মতো আনুগত্য আর ভীরু কাপুরুষতার পরিবর্তে মৃত্যুঞ্জয়ী সাহসী যোদ্ধার চরিত্র। যারা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল, যাদের কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল না তারা এলেন একজন নেতার অধীনে। মরুর মাটি কামড়ে থাকা মাটিতে জন্ম মৃত্যু ছাড়া যাদের জীবনের কোন লক্ষ্য ছিল না, তাদের লক্ষ্য হয়ে গেল সমগ্র মানবজাতিকে অন্যায়, অবিচার ও অশান্তি থেকে মুক্তি দেওয়া। স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক মানুষগুলোকে মানবতার কল্যাণে উৎসর্গকৃত প্রাণে পরিণত করলেন। মাত্র ত্রিশ বছরের ব্যবধানে তারা তৎকালীন পৃথিবীর দুই দুইটি পরাশক্তি রোমান এবং পারস্য সাম্রাজ্যকে একসাথে পরাজিত করে সেখানে ন্যায়, সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করল। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সামরিক শক্তি, কূটনীতি, সাহসিকতার নতুন দৃষ্টান্ত তারা পৃথিবীর বুকে স্থাপন করলেন।

কিসে তাদের এই অচিন্তনীয় সফলতা এনে দিল? এর উত্তর হচ্ছে এমন এক আদর্শ, প্রকৃত ইসলাম যা মহান আল্লাহ তাঁর শেষ রসুলকে দান করলেন এবং এই আদর্শ দুনিয়াময় প্রতিষ্ঠা করারও দায়িত্ব দিলেন (সুরা ফাতাহ- ২৮, তওবা- ৩৩)। এই জন্য আল্লাহর রসুল বলেছিলেন- আমি আদিষ্ট হয়েছি সংগ্রাম চালিয়ে যেতে (ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার) যে পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আল্লাহকে তাদের একমাত্র এলাহ এবং আমাকে তাঁর রসুল হিসেবে মেনে না নেয় (আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বোখারী, মুসলিম ও মেশকাত) এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আল্লাহর রসুল সংগ্রাম শুরু করলেন এবং যারা তাঁর অনুসারী হলেন তাদেরকে হাতে-কলমে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুললেন। আরব উপদ্বীপে আল্লাহ থেকে আনীত এই দীন প্রতিষ্ঠার পর তিনি মহান প্রভু আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। জাতির কাছে রেখে গেলেন দুইটি জিনিস। কোর'আন ও তাঁর সুন্নাহ। পরবর্তীতে তাঁর অনুসারী অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদী বাড়ি-ঘর, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন এমনকি স্বদেশকে চিরতরে ত্যাগ করে সেই দায়িত্ব পালন করতে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো এবং ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিল।

কিন্তু দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে অর্ধ-দুনিয়া বিজয়ের পরে মাত্র ৬০/৭০বছরের মধ্যে তারা তাদেরকে জাতি হিসেবে সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য ভুলে গেল। মানবতা, সাম্য, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বাদ দিয়ে তারা এই অর্ধদুনিয়ার উপর আর অন্য সব রাজা-বাদশাহদের মতো রাজত্ব করা আরম্ভ করল।

তখন কিন্তু এই জাতির পায়ের নিচে অর্ধ-পৃথিবী। কিন্তু তারা আল্লাহ ও রসুলের দেওয়া শর্ত মোতাবেক মো'মেন ও উম্মতে মোহাম্মদী রইলো না। কারণ আল্লাহর দেওয়া সংজ্ঞা মোতাবেক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করা বাদ দিলো।

জাতির নেতারা ভোগবিলাসের সঙ্গে যখন বাদশাহী আরম্ভ করল তখন থেকেই মূলতঃ ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে লিপ্ত হয়। এখান থেকেই কারবালার মতো ঘটনা ঘটার জন্য রসদ সৃষ্টি হয়। হাসান-হোসাইন এবং আব্দুল্লাহর পূর্ব পুরুষগণ নিজেদের রক্ত দিয়ে যে বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন তা তারা আসার পর স্তব্ধ হয়ে গেল। অথচ এই দুঃখজনক ঘটনা এই জাতির মাঝে ঘটার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। রসুলাল্লাহ বলেছেন- ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে নিহত উভয়ই জাহান্নামে যাবে। যে কোনো ধরনের ঐক্যহীনতা কুফরের শামিল। এমনকি তা যদি চোখের ঈশারাও হয়। বিদায় হজ্বের ভাষণে রসুলাল্লাহ(সা.) জাতিকে শেষবারের মতো এই কথাগুলোই স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছেন। কিন্তু কারবালার ঘটনায় যারা নায়ক কিংবা খল নায়ক হিসেবে চিত্রিত হচ্ছেন তারা উভয়ে মিলে জাতির জন্য লজ্জাজনক ও ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের অবতারণা করেছেন। এটি সম্ভব হয়েছে কেবল জাতির মূল আকীদাচ্যুতির কারণে। আকীদার বিকৃতির কারণেই খেলাফতের পরিবর্তে উমাইয়ারা বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র শুরু করেছে। একেকজন গর্বভরে উচ্চারণ করেছেন 'আমি আরবের বাদশাহ' (কায়সারুল আরব, কিসরাতুল আরব) বলে। স্বাভাবিকভাবে তাদের চাল-চলনও হয়ে দাঁড়াল আর অন্য সকল রাজা বাদশাহদের মতই। একেক জন রাজার তখ্ত-তাওস, রাজকীয় ভোগ বিলাস দেখতে পেলে খুব সম্ভবতঃ শাদ্দাদও লজ্জা পেত। অথচ ইসলামের প্রাথমিক যুগের খলিফাগণ

ধূলোর তখ্‌তে বসে দুনিয়া শাসন করতেন। দূর-দূরান্ত থেকে অভ্যাগতগণ বুঝতেই পারতেন না কে খলিফা আর কে সাধারণ জনতা। তারা অন্যদের মতই স্বাভাবিক উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। রাষ্ট্র থেকে ভাতা গ্রহণে জনতা বাধ্য করলেও আবু বকর (রা.) তাঁর এন্তেকালের পূর্বে তার শেষ সম্বল জমিটুকু বিক্রি করেও অতীতে ভোগ করা ভাতার টাকা বায়তুল মালে শোধ করে দিয়ে গেছেন।

পরবর্তীতে যদি রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেন, সিংহাসন নিয়ে কামড়া-কামড়ি না করতেন তাহলে কারবালার সেই হৃদয় বিদারক ও দুঃখজনক ঘটনার উৎপত্তি হোত না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যারা আশুরা দিবস পালন করছেন, তাদেরকে সেই শোককে শক্তিতে পরিণত করতে হবে। তাদের মনে রাখতে হবে-আল্লাহর তওহীদ ত্যাগ করে, রসুলাল্লাহর উম্মত থেকে বহির্গত হয়ে, আল্লাহর রসুলের দেখানো দিক নির্দেশনাকে ভুলে গিয়ে জাতির মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত করে দাজ্জালীয় ভোগবাদী সভ্যতাকে মেনে নিয়ে আজকের শিয়া-সুন্নি, হানাফি, হাম্বলী সব মাজহাব ফেরকাই ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে। কে কত মাইল দূরে গেছে সেই হিসেব করা এখানে গুরত্বপূর্ণ বিষয় নয়। সকলেই ইসলাম থেকে এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে বহু দূরে, মহানবীর শিক্ষা থেকে, আল্লাহর হুকুম থেকে বহু দূরে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গিয়েও নিজেদের কাজকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য ১৪০০ বছর থেকে বহু কেতাব, বই রচনা করা হয়েছে। তাদের প্রতি আমাদের কথা হচ্ছে অতীতের দুঃখকে স্মরণ করতে হবে ঠিক, কিন্তু অতীতের ভুলগুলো যদি সংশোধন না করা হয় তবে এ থেকে উম্মাহর কী প্রাপ্তি হবে?

এখন তাদের উভয়েরই উচিত হবে আল্লাহর তওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। মনে রাখতে হবে মাতম কোন জীবন্ত জাতির কাজ নয়। জীবন্ত জাতি কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সর্বস্ব ত্যাগে সব সময় আল্লাহর সামনে মাথা উঁচু করে দণ্ডায়মান থাকে। ত্যাগ করতে পারলে নিজেকে গর্বিত মনে করে। কান্নার পরিবর্তে আনন্দ করে। এজিদের বংশধর এখনো দুনিয়াতে আছে তাই এখন অতীতের জন্য শোক নয়, বরং অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদেরকে সংশোধন করে এক কাতারে দাঁড়াতে হবে। রসুলের আরদ্ধ কাজ করে উম্মতে মোহাম্মদীর খাতায় নিজেদের নাম লেখাতে হবে। কাজেই এখন উপলব্ধির বিষয়, আত্মসমালোচনার বিষয় কোথায় পথ হারিয়েছি, কোথায় ভুল করেছি, কেন আমাদের দুনিয়াজোড়া এই দুর্গতি? কীভাবে শিয়া-সুন্নি নামক ভয়াবহ জাতিবিনাশী বিভক্তি দূর হবে, অন্তত হতভাগ্য জাতি রক্ষা পাবে। কারবালার দুঃখজনক ঘটনার পরেও কি এই জাতির উপর দিয়ে বহু হৃদয়বিদারী কারবালা হয় নি? হয়েছে, এখনো হচ্ছে। জাতীয় কবি নজরুলের ভাষায় বলতে হয়–

মুসলিম! তোরা আজ 'জয়নাল আবেদীন'।
ওয়া হোসেনা- ওয়া হোসেনা' কেঁদে তাই যাবে দিন!
ফিরে এলো আজ সেই মহররম মাহিনা,
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না।
উষ্ণীষ কোরানের, হাতে তেগ্ আরবীর,
দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির।

আকিদা-ঈমান-আমল

মূল: এমামুয্‌যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

লক্ষ-কোটি টাকা খরচ করে আলীসান মসজিদ হচ্ছে। টাইলসের মসজিদ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মসজিদ, সোনার গম্বুজ ওয়ালা মসজিদ বিভিন্ন রকম মসজিদ হচ্ছে যেন সবাই শান্তিতে নামাজ পড়তে পারে। সহিহ্-শুদ্ধভাবে কোর'আন শিক্ষা হচ্ছে, নামাজের নিয়ম-কানুন শিক্ষা হচ্ছে, মানুষ মাদ্রাসা-মক্তবে যাচ্ছে যেন শুদ্ধভাবে নামাজ পড়তে পারা যায়। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মানুষ হজ্বে যাচ্ছে, কোরবানি দিচ্ছে, যাকাত দিচ্ছে, রমজান মাসে রোজা রাখছে এমনকি অনেকে সারা বছর নফল রোজাও রাখছে, সারারাত জেগে নফল নামাজ পড়ছে অর্থাৎ আমল করা হচ্ছে, প্রচুর আমল। আমল যেন নির্ভুল হয় সেজন্য আমরা সদা তৎপর কিন্তু সমস্ত আমলই অর্থহীন, ব্যর্থ হয়ে যাবে যেটা না থাকলে সেটার ব্যাপারে আমরা কতটা সচেতন?

যে কোনো আমলের পূর্বশর্ত হচ্ছে ঈমান। ঈমান ছাড়া আমল অর্থহীন। এখন এই ঈমান কী? ঈমান হলো- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদুর রসুলাল্লাহ (সা.), আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা নেই এবং মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রসুল" এই কলেমাতে স্বীকৃতি দেওয়া। অর্থাৎ ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে জাতীয়, আন্তর্জাতিক এক কথায় জীবনের সর্ব অঙ্গনে আল্লাহর হুকুম তথা যাবতীয় ন্যায়কে মেনে নেওয়ার স্বীকৃতিই হচ্ছে ঈমান। সহজ কথায় যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ন্যায় স্থাপনার জন্য দৃঢ়প্রত্যয়ী হওয়া।

স্বীকৃতির পরবর্তী কাজ হলো আল্লাহর রাস্তায় জীবন ও সম্পদ দিয়ে যাবতীয় অন্যায় দূর করে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এটিই হলো সর্বপ্রথম এবং প্রধান আমল। এটি ছাড়া মো'মেন হওয়া যায় না। (সুরা হুজরাত-১৫)। যখন মানুষ তার জীবনে আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে প্রত্যাখ্যান করেছে তখন সমাজ থেকে সকল প্রকার অন্যায় অবিচার দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বাদ দিয়ে যত আমলই করা হোক তা নিরর্থক হবে।

এমামুয্যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

আজ আমাদের এই আমল নিরর্থক হচ্ছে কি না ভাবতে হবে। আমরা আল্লাহ, নবী-রসুল, আসমানি কিতাব, আখেরাত, জান্নাত-জাহান্নাম, তকদির ইত্যাদিতে বিশ্বাস করি কিন্তু ঈমান এই বিশ্বাসটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম তথা ন্যায়, সত্য ধারণ করা এবং জীবন-সম্পদ দিয়ে সকল প্রকার অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করাই হচ্ছে প্রকৃত আমল। আজ আমরা নামাজ-রোজাসহ অনেক আমল করছি কিন্তু যে যার ক্ষেত্রে স্বার্থপর, ভোগবাদী পশ্চিমা বস্তুতান্ত্রিক আত্মাহীন দাজ্জালীয় সভ্যতার দর্শনে দীক্ষিত। ন্যায়ের বদলে অন্যায়কে ধারণ করেছি, আল্লাহর হুকুম তথা কলেমার মর্মবাণী প্রত্যাখ্যান করে মুখে কলেমার বাণী উচ্চারণ করে মো'মেন থাকা যায় না। মুখে মুসলিম দাবিদার হয়ে অন্যায়, অবিচার, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বার্থপরতার জীবন দর্শন ধারণ করে সত্যিকার অর্থে মুসলিম থাকা যায় না।

কিন্তু আমরা একটা দৃশ্য সর্বত্র দেখতে পাই, শহর-গ্রাম, পাড়া-মহল্লাসহ সব জায়গাতেই মানুষ টুপি-পাঞ্জাবী পরে টাখনুর উপর পাজামা তুলে মসজিদে নামাজ পড়তে যাচ্ছে, কোরবানি করছে, হজ করে আসছে, ওয়াজ-মাহফিল শুনছে, কোর'আন তেলাওয়াত করছে, যিকির-আসগর করছে। অর্থাৎ আমরা বুঝাতে চাইছি আমরা পাক্কা মুসলমান। কিন্তু কিভাবে? এই যে আমল করে যাচ্ছি আমাদেরকে কে বলে দেবে সমাজে যখন চূড়ান্ত অন্যায় চলে, চরম অশান্তি চলে, মানুষগুলো ত্রাহী সুরে চিৎকার করে বাঁচার জন্য তখন তাদের জন্য ন্যায়পূর্ণ, শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণের চেষ্টা না করে পাহাড় সমান আমল করলেও তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

কাজেই আগে আল্লাহর কলেমা, তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিয়ে (ন্যায় ও সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে) মো'মেন হওয়া জরুরি। তারপরে যত পারা যায় ঐসব আমল। ঐ আমল জান্নাতের স্তর বৃদ্ধি করবে। কাজেই আগে ঈমান পরে আমল। আগে ঈমানের শর্ত পূরণ করা মো'মেনের অবশ্য কর্তব্য।

আরেকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- ঈমানের পূর্বশর্ত হচ্ছে আকিদা। এ বিষয়ে সমস্ত আলেম ও ফকিহগণ একমত যে, আকিদা সঠিক না হলে ঈমানের কোনো মূল্য নেই। যে জিনিসটি সঠিক না হলে ঈমানের কোনো মূল্য নেই- সেই জিনিসটি অবশ্যই অতি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতসহ সকল ইবাদতের মূল হচ্ছে ঈমান। কিসের ওপর ঈমান? আল্লাহর, তাঁর রসুলদের, মালায়েকদের, হাশরের দিনের বিচারের, জান্নাত, জাহান্নাম, তকদীর ইত্যাদির ওপর ঈমান। এই ঈমান অর্থহীন হয়ে গেলে স্বভাবতঃই এই নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত এবং অন্যান্য সমস্ত রকমের ইবাদতও অর্থহীন। যে জিনিস সঠিক না হলে ঈমান এবং ঈমান ভিত্তিক সমস্ত আমল অর্থহীন সেই মহাগুরুত্বপূর্ণ আকিদা কী?

আকিদা হচ্ছে কোনো জিনিস বা ব্যাপার সম্বন্ধে সঠিক ও সম্যক ধারণা অর্থাৎ Comprehensive concept। কোনো জিনিস বা ব্যাপার, তা সে যে কোনো জিনিস হোক না কেন, সেটা দিয়ে কি হয়, সেটার উদ্দেশ্য কী সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা বা Comprehensive concept হচ্ছে আকিদা। যে কোনো জিনিস বা ব্যাপার সম্বন্ধে এই ধারণা পূর্ণ ও সঠিক না হলে সেই জিনিসটি অর্থহীন। আল্লাহ তাঁর রসুলদের (আ.) মাধ্যমে মানবজাতিকে দীন অর্থাৎ জীবন-ব্যবস্থা দিয়েছেন। তিনি কি কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই এই দীন দিয়েছেন? অবশ্যই নয়। নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে। যদি আমরা সেই উদ্দেশ্য না বুঝি বা যদি সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা করি, তবে ঐ দীন অর্থহীন হয়ে যাবে। এ জন্যই ফকিহরা, ইমামরা সকলেই একমত যে আকিদা অর্থাৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা সঠিক না হলে ঈমান ও সমস্ত ইবাদত নিষ্ফল।

একটি উদাহরণ দিচ্ছি। কেউ আপনাকে একটি মটর গাড়ি উপহার দিলেন। মনে করুন এই মটর গাড়িটি ইসলাম- আল্লাহ মানব জাতিকে যা উপহার দিয়েছেন। যিনি গাড়িটি উপহার দিলেন তিনি ঐ সঙ্গে গাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণ কেমন করে করতে হবে সেই নিয়মাবলীর একটি বইও দিলেন, যাকে বলা হয় Maintenance

Book। মনে করুন এই বই কোর'আন ও সহীহ হাদিস। গাড়ির উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হচ্ছে ওটাতে চড়ে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া। এটাই হচ্ছে গাড়িটির আসল উদ্দেশ্য। ওটাকে তৈরিই করা হয়েছে ঐ উদ্দেশ্যে। কিন্তু ঐ সঙ্গে আরামে বসার জন্য তার ভিতরে গদীর আসন তৈরি করা হয়েছে, খবর, সঙ্গীত শোনার জন্য রেডিও, ডিভিডি প্লেয়ার লাগনো হয়েছে, গাড়িটিকে সুন্দর দেখাবার জন্য চকচকে রং করা হয়েছে। গাড়িটির সঙ্গে যে Maintenance বই আপনাকে দেয়া হয়েছে তাতে বলা আছে গাড়িটিতে কোন্ ধরনের পেট্রোল দিতে হবে, কত নম্বর মবিল দিতে হবে। কোথায় কোথায় চর্বি (Grease) দিতে হবে ইত্যাদি। শুধু তাই নয় দেখতেও যেন গাড়িটি সুন্দর হয় সেজন্য কোথাও রং খারাপ হয়ে গেলে কেমন রং কেমন ভাবে লাগালে গাড়ি সুন্দর দেখাবে তাও সব কিছু আছে। ঐ Maintenance বইয়ে এত সব কিছু লেখা থাকলেও মূল সত্য হচ্ছে এই যে ঐ গাড়ি তৈরির উদ্দেশ্য হচ্ছে ওটা আপনাকে আপনার প্রয়োজনীয় গন্তব্যস্থানে নিয়ে যাবে। বাকি সব ঐ উদ্দেশ্যের পরিপূরক। এখন আপনি যদি না জানেন ঐ গাড়িটি দিয়ে কী হয়, ওটাকে কী উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে তবে আপনাকে ঐ গাড়িটি উপহার দেয়া নিষ্ফল, অর্থহীন। ঐ গাড়িটির উদ্দেশ্য আপনাকে প্রয়োজন মোতাবেক ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর নিয়ে যাওয়া। আপনি যদি সেটাই না বোঝেন তবে আপনি কী করবেন? আরামের গদি দেখে ভাববেন এই গাড়িটিকে তৈরি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই গদিতে বসে আরাম করা। কিম্বা ভাববেন এটা তৈরির উদ্দেশ্য হচ্ছে রেডিও শোনা, সঙ্গীত শোনা। আর তাই মনে করে আপনি গাড়িটির আরামের সিটে বসে রেডিও, ডিভিডি বাজাবেন।

এই হলে আপনার আকিদার ভুল হলো। আপনাকে গাড়িটি উপহার দেয়া অর্থহীন হলো কারণ ওটার আসল উদ্দেশ্যই আপনি বুঝলেন না। আপনি যদি গাড়ির Maintenance বই দেখে দেখে অতি সতর্কতার সাথে যথাস্থানে চর্বি লাগান, মবিল দেন, চাকায় পাম্প দেন, গাড়ির ট্যাংকে তেল দেন, গাড়ির রং পালিশ করেন, তবুও সবই অর্থহীন যদি আপনি না জানেন যে গাড়িটির আসল উদ্দেশ্য কী। অর্থহীনতা ছাড়াও আরও একটি ব্যাপার হবে। সেটা হলো আপনার অগ্রাধিকারের (Priority) ধারণাও ভুল হয়ে যাবে। তখন আপনার কাছে গাড়ির ইঞ্জিনের চেয়েও প্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে গাড়ির রেডিও, ডিভিডি প্লেয়ার, গাড়ির রং ইত্যাদি। অর্থাৎ অগ্রাধিকার ওলট-পালট হয়ে গিয়ে অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে যাবে অতি সামান্য বা একেবারে বাদ যাবে আর অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে মহা প্রয়োজনীয়। এ জন্যই সমস্ত আলেম, ফকিহ, ইমামরা একমত হয়েই বলেছেন যে, আকিদা অর্থাৎ কোনো ব্যাপার বা জিনিস সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা না হলে বা ওটার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা হলে সম্পূর্ণ জিনিসটাই অর্থহীন- ঈমান এবং ঈমান ভিত্তিক অন্যান্য আমলও অর্থহীন।

আল্লাহ আমাদের ইসলাম বলে যে দীন, জীবন-বিধান দিয়েছেন সেটার উদ্দেশ্য কী, সেই আকিদা আমাদের বহু পূর্বেই বিকৃত হয়ে ঐ গাড়ির মালিকের মতো হয়ে গেছে- যে গাড়ির উদ্দেশ্যই জানে না। ঐ মালিকের মতো আমরা Maintenance বই, অর্থাৎ কোর'আন-হাদিস দেখে দেখে অতি সতর্কতার সাথে গাড়ির পরিচর্যা করছি- কিন্তু ওটাতে চড়ি না, ওটা চালিয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় গন্তব্যস্থানে যাই না, গ্যারেজে রেখে দিয়েছি- কারণ ওটার আসল উদ্দেশ্যই আমরা জানি না বা যেটা মনে করি তা ভুল বা বিকৃত। কাজেই আমাদের অগ্রাধিকারও (Priority) ওলট-পালট হয়ে গেছে। প্রকৃত উদ্দেশ্যই অর্থাৎ তওহীদ ও তা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আমরা ত্যাগ করেছি, কিন্তু গাড়ির রং, পালিশ, অর্থাৎ দাড়ি, টুপি, পাগড়ী, আলখাল্লা সম্বন্ধে আমরা অতি সতর্ক। আকিদার বিকৃতি ও তার ফলে অগ্রাধিকারের ওলট-পালটের পরিণাম এই হয়েছে যে, আল্লাহ আমাদের ত্যাগ করেছেন, আমরা তাঁর গযবের ও লানতের পাত্রে পরিণত হয়েছি।

আকিদার ভুলের কারণে ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেহাদকে আজ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যবহারের পরিবর্তে জঙ্গিবাদ সৃষ্টিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইসলাম মানবজাতির যাবতীয় সমস্যা দূর করে ন্যায় ও শান্তিপূর্ণ একটা সমাজ উপহার দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু আকিদা ভুল হওয়ার কারণে আজ ইসলামকে কেবল সওয়াব কামানোর মাধ্যম গণ্য হচ্ছে, কিছু রীতি-নীতি, আনুষ্ঠানিকতাকেই ইসলাম মনে করা হচ্ছে। আকিদা ভুল হওয়ার কারণে ইসলামের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না, ফলে আমরা আজ পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জাতিতে পরিণত হয়েছি। অন্য সমস্ত জাতি, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র আমাদের গণহত্যা করছে, আমাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, আমাদের পর্দানশিন মা-বোনদের ধর্ষণ করছে, হাজারে হাজারে আমাদের মসজিদ ধ্বংস করে দিচ্ছে। আর নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক হানাহানি, অবিশ্বাস, দ্বন্দ্ব, অনৈক্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার ইত্যাদির মধ্যে ডুবে আছি অর্থাৎ অশান্তির মধ্যে আছি। অশান্তির মধ্যে আছি মানেই ইসলামে (ইসলাম শব্দের আক্ষরিক অর্থই শান্তি) নেই।

এখন এই লানৎ, শাস্তি থেকে পরিত্রাণের একটাই পথ, আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া। সেই প্রকৃত, অনাবিল, শান্তিদায়ক, নিখুঁত, ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে আল্লাহ যেটা পাঠিয়েছিলেন সেটা কোথায় পাওয়া যাবে?

সেটা আল্লাহ হেযবুত তওহীদকে দান করেছেন। আমরা ইসলামের প্রকৃত আকিদা সমস্ত মানবজাতির সামনে তুলে ধরছি, এই আকিদা ফিরে পেলে আমরাই সমস্ত মানবজাতিকে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে পারব, সমস্ত মানবজাতিকে একটি পরিবারে পরিণত করতে পারব ইনশা'আল্লাহ।

রাজধানীর সূত্রাপুরে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী জনসভায় হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমাম ও উপস্থিত জনতার একাংশ।

প্রিয় জন্মভূমির উপর একটা আঁচড়ও লাগতে দেব না ইনশাল্লাহ

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

সমস্ত পৃথিবী অন্যায়, অবিচার, জুলুম, রক্তপাত, খুন, সন্ত্রাস, রাহাজানি, ধর্ষণ এক কথায় চরম অশান্তিতে পরিপূর্ণ। প্রতিটা মুহূর্ত কাটছে যুদ্ধের আতঙ্কে। চল্লিশ হাজারেরও বেশি পারমাণবিক বোমা তৈরি করে রাখা হয়েছে মানবজাতিকে বিনাশ করে দেয়ার জন্য। এমন কোন সমাজ নেই যেখানে মানুষ ত্রাহী সুরে চিৎকার করছে না। একসঙ্গে এত ক্রন্দন, এত অশান্তি পৃথিবীর বুকে আর কখনো হয়নি। গত শতাব্দীতে দুই-দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হলো, চৌদ্দ কোটি বনি-আদমকে হত্যা করা হলো, পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ হলো আরো কোটি কোটি মানুষ। মজলুমের উপর জালিমের অত্যাচার, দরিদ্রের উপর ধনীর বঞ্চনা, সরলের উপর ধূর্তের প্রতারণা চলছে। সমস্ত পৃথিবী আজ নারী এবং শিশুর রক্তে তেজা। এই অবস্থায় চিন্তাশীল মানুষ, আত্মাসম্পন্ন মানুষ আজ দিশেহারা। নতুন নতুন আইন তৈরি হচ্ছে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সংখ্যা, সক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে। তাদেরকে নতুন নতুন প্রযুক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করা হচ্ছে মানুষকে শান্তি দেয়ার জন্য, অপরাধ নির্মূল করার জন্য। কিন্তু কয়েক দশকের ঘটনাপ্রবাহ পরিসংখ্যান করলে দেখা যাবে যে, অন্যায়-অবিচার, জুলুম-রক্তপাত ধাঁইধাঁই করে বাড়ছে। এর কারণ কী তা নিয়ে আজকে আমাদের ভাবতে হবে। আমরা মানুষ (আশরাফুল মাখলুকাত), মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এক অসাধারণ সৃষ্টি। এই মানুষ তো পশুর মতো জীবন-যাপন করতে পারে না। তাহলে তাকে যে কারণে সৃষ্টির করা হয়েছে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। ঐ পশুর সঙ্গে, বৃক্ষরাজির সঙ্গে মানুষের মৌলিক কয়েকটি তফাৎ রয়েছে, পবিত্র কোর'আন থেকে আমরা পাই-

১. এই মানুষকে আল্লাহ নিজ হাতে বানিয়েছেন। অন্য কোন সৃষ্টিকে আল্লাহ এভাবে নিজ হাতে বানাননি। (সুরা ছোয়াদ- ৭৫)।

২. এই মানুষের ভেতরে আল্লাহর পবিত্র রূহ আছে। অন্য কোন সৃষ্টির মধ্যে এটি নেই। (সুরা হিজর- ২৯)।

৩. সমস্ত সৃষ্টিকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন মানুষকে (খলিফাকে) সেজদা করতে। অর্থাৎ তাকে সার্ভিস দিতে, সেবা করতে। (সুরা ছোয়াদ- ৭২-৭৩)।

৪. এই মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি, আল্লাহর খলিফা (সুরা বাকারা ৩০)। অন্য কোন সৃষ্টিকে আল্লাহ বলেননি, তোমরা পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি।

এজন্য আমরা আজ বিদ্যুৎকে চাকরের মতো খাটাচ্ছি, গরু-ছাগলকে জবাই করে তার গোস্ত খাচ্ছি। বৃক্ষকে জ্বালানি কাঠ হিসেবে ব্যবহার করছি, চন্দ্র-সূর্য ক্রমাগত আমাদের সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে। কাজেই আমরা পশুর মতো নই। আমাদের এই জীবনের প্রতিটা মুহূর্তই মহামূল্যবান। আমাকে ভাবতে হবে আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? আমার গন্তব্য কোথায়? আমাকে ভাবতে হবে আমার সমাজকে নিয়ে। কারণ, আমার সমাজ আমার দেহের মতো। আমার দেহের মধ্যে যদি কোন রোগ হয়, সঙ্গে সঙ্গে যদি ঔষধ না খাই তবে আমি মৃত্যুমুখে পতিত হবো। আমাকে ভাবতে হবে আমার রাষ্ট্রকে নিয়ে। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব না থাকলে আমার অস্তিত্ব থাকবে না। আমাকে ভাবতে হবে আমার এই বিশ্বকে নিয়ে। কারণ আল্লাহ এই পৃথিবীতে মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা হিসাবে প্রেরণ করেছেন (সুরা বাকারা- ৩০)। কাজেই এই পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে-না হচ্ছে, কে অশান্তির মধ্যে আছে, এই অশান্তির কারণ কী, এই অশান্তি দূর করায় আমার কী ভূমিকা রয়েছে- এগুলো নিয়ে ভাবতে হবে। যদি না ভাবি, স্বার্থপরের মতো আত্মকেন্দ্রিক জীবন-যাপন করলে আমি তো মানুষই থাকতে পারব না। ব্যর্থ হবে আমার সকল এবাদত-বন্দেগি।

আল্লাহ আমাদেরকে চিন্তাশক্তি দিয়েছেন, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত যাচাই করার জন্য। দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন সাদা এবং কালো দেখার জন্য। শ্রবণশক্তি দিয়েছেন শোনার জন্য এবং হৃদয় দিয়েছেন উপলব্ধি করার জন্য। কাজেই একজন বললো আর অমনি আপনি দৌড়ে চলে যাবেন সেদিকে সওয়াব হবে এই আশায়, এটা ভুল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁকে বিশ্বাস করার বেলায় কোথাও বলেননি যে, অন্ধের মতো শুধু আমাকে বিশ্বাস কর। তিনি বলেছেন, দেখ, দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখ আমার সৃষ্টির কোথাও কোন ত্রুটি পাও কিনা (সুরা মুলক- ৩)।

কাজেই কোন সিদ্ধান্ত নিবেন, কোন আমল করবেন, কোনদিকে যাবেন, কেন যাবেন, তাতে আপনার কী উপকার, মানবজাতির কী উপকার ইত্যাদি আগে বিচার-বিশ্লেষণ করুন।

জঙ্গিবাদ কারা সৃষ্টি করল:

আজকে পৃথিবীময় যে জঙ্গিবাদী তাণ্ডব চলছে এই জঙ্গিবাদী তাণ্ডব কোত্থেকে শুরু হলো, কারা এটাকে প্রোমোট করছে, কারা অস্ত্র দিয়ে, অর্থ দিয়ে, গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে সমস্ত বিশ্বময় জঙ্গিবাদের বিস্তার ঘটাচ্ছে- এই তথ্য আজকে সবাইকে জানতে হবে। নির্বোধের মতো চোখ বন্ধ করে থাকলে হবে না। কারণ যে সংবাদ এতদিন আফগানিস্তান, সিরিয়া, ইরাকের সংবাদ ছিল আজকে সেই সংবাদ সৃষ্টি হচ্ছে আমার পবিত্র জন্মভূমিতেও। কাজেই এই জঙ্গিবাদ নিয়ে আজকে আমাদের প্রত্যেককে সজাগ এবং সতর্ক হতে হবে। এই জঙ্গিবাদ আমার পবিত্র ধর্ম ইসলাম থেকে সৃষ্টি হয়নি। এ এক বিরাট আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক ব্লক ও যুক্তরাষ্ট্র-ব্রিটেনের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্লকের মধ্যে চলছিল শীতল যুদ্ধ (Cold War)। আফগানিস্তানের মাটিতে যখন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ান ব্লক আসলো তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করার জন্য পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্লক যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে ব্যবহার করলো। সমাজতন্ত্রকে কুফরি ব্যবস্থা আখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে বোঝানো হলো সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তথা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলমানদের জন্য জেহাদ। সেখানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তৈরি করা হলো তালেবান, তাদেরকে প্রশিক্ষণ, অস্ত্র, অর্থ দিয়ে সাহায্য করল যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা। সারা পৃথিবী থেকে মুসলিম তরুণদের রিক্রুট করা হলো আফগানিস্তানের মাটিতে। এটা ছিল মূলত দুই পরাশক্তির ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। লক্ষ লক্ষ তরুণের প্রাণ আফগানিস্তানের মাটিতে মিশে গেছে। মানবজাতি উপকৃত হয় নি। ইসলামেরও কোনো উপকার হয়নি। বরং সেখানে মানুষের ঈমান ভুল খাতে প্রবাহিত হয়েছে। সেখান থেকে শুরু হলো জঙ্গিবাদী তাণ্ডব। তারপর এই জঙ্গিবাদকে একটার

রাজধানীর সূত্রাপুরে হেযবুত তওহীদ কর্তৃক আয়োজিত সন্ত্রাসবাদ বিরোধী জনসভায় হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমাম ও স্থানীয় রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ।

পর একটা মুসলিম দেশে রপ্তানি করা হয়েছে এবং সেই ছুতোই ধ্বংস করা হয়েছে একটা একটা করে মুসলিমপ্রধান দেশ।

জঙ্গিবাদের ইসলাম প্রকৃত ইসলাম নয়ঃ

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে আমরা ৯০% মুসলমান। সম্প্রতি যে জঙ্গি হামলাগুলো হলো এই হামলা শুধু আমার দেশের বিরুদ্ধে নয়, আমার প্রিয় ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধেও। এই পৈচাশিক কর্মকাণ্ড দেখে পৃথিবীময় ইসলাম সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে। এই হামলাগুলির পর দুনিয়াময় ইসলামের প্রতি বিদ্বেষভাব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা আমার রসুলকে আক্রমণ করে কথা বলছে, পবিত্র কোর'আনকে দোষারোপ করছে এবং দুনিয়াময় যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, মুসলমানদের ভাল চায় না, তারা এই অপবাদ প্রতিষ্ঠা করার একটা সুযোগ পেয়েছে যে- মুসলমান সন্ত্রাসী, ইসলাম একটা সন্ত্রাসের ধর্ম, কোর'আন জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করে (নাউযুবিল্লাহ)।

আমরা মো'মেন-মুসলিম-উম্মতে মোহাম্মদীরা মাথা উঁচু করে এই কথার প্রতিবাদ করতে পারি না। কিসের এত হীনম্মন্যতা আমাদের? এখন আমরা পরিষ্কার বলব, তোমরা যা করছ এটা আল্লাহ-রসুলের ইসলাম নয়। তোমাদের এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দেখে একথা চিন্তা করার কোনো কারণ নেই যে, আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হারাবো, পবিত্র কোর'আনের প্রতি ঈমান হারাবো, আখেরী নবী হুজুরেপাক (সা.) এর প্রতি শ্রদ্ধা হারাবো। কারণ আমরা জানি আল্লাহর পক্ষ থেকে আজ আমাদের কাছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা চলে এসেছে।

আল্লাহ আসমান-জমিন, গ্রহ-নক্ষত্র, বৃক্ষরাজি-তরুলতা সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ হক, সত্য। আল্লাহ যুগে যুগে নবী রসুল পাঠিয়েছেন সেই নবী-রসুলগণ হক, সত্য। রসুলকে আল্লাহ যে কিতাব দিলেন, সেই কিতাবের শুরুতেই বললেন- "লারাইবা ফিহে হুদাল্লিল মুত্তাকিন। এই কিতাবে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকিদের জন্য এটা হেদায়াহ।" তাহলে কিতাব হক, সত্য। আল্লাহর রসুল (সা.) অক্লান্ত পরিশ্রম করে কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে উম্মতে মোহাম্মদী নামে যে জাতি গঠন করলেন সেই জাতি হক, সত্য। যা সত্য তার ফল হয় শান্তিদায়ক। আল্লাহ যে দীন দিলেন ১৪০০ বছর আগে, যে কিতাব পাঠালেন, রসুল (সা.) উম্মতে মোহাম্মদী জাতি গঠনের মাধ্যমে সেই সত্যদীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করলেন, সেই সত্য, হক প্রতিষ্ঠার ফল ছিল চূড়ান্ত শান্তি। তাহলে আজকে দুনিয়াময় ধর্মের নামে যা চলছে, এটা কি হক, সত্য? এর ফল কি শান্তিদায়ক হচ্ছে?

শাস্ত্রে একটি কথা আছে, বৃক্ষ তোমার নাম কী, ফলে পরিচয়। একটা বৃক্ষের ফল হয়েছিল মিষ্টি আর একটা বৃক্ষের ফল হয়েছে তিতা। মানুষ ঘৃণা করছে। তোমরা যারা ইসলামের নামে-ধর্মের নামে স্বার্থ উদ্ধার করছ, অর্থ রোজগার করছ, অপরাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহার করছ, যারা জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড করে ইসলামের নামে চালিয়ে

দিচ্ছ এটা আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত ইসলাম নয়। এই কথা বলার জন্য হেযবুত তওহীদের আগমন।

ইসলামের উদ্দেশ্য কী?

একদিন আল্লাহর রসুল (সা.) পবিত্র কাবা ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন। হযরত খাব্বাব (রা.) বলছেন, "ইয়া রসুলাল্লাহ (সা.) এই অত্যাচার আর সহ্য করতে পারছি না। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন- এই কাফেররা যেন ধ্বংস হয়ে যায়।" তখন আল্লাহর রসুল (স.) সোজা হয়ে বসলেন। তিনি বললেন, "না, কখনো না। অপেক্ষা কর। এমন সময় আসছে যখন একা একটা মেয়ে মানুষ গায়ে স্বর্ণালংকার পরিহিত অবস্থায় সানা থেকে হাদরামাউত (প্রায় সাড়ে তিনশ' মাইল) রাতের অন্ধকারে হেঁটে যাবে কিন্তু আল্লাহ এবং বন্য জন্তু ছাড়া কোন ভয় তার মনে উদয় হবে না।" আল্লাহর রসুল (সা.) এমন শান্তি, নিরাপত্তা, ন্যায় এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেলেন। আল্লাহর রসুল (সা.) মক্কার সবচাইতে বিশৃংখল, ঐক্যহীন, আইয়্যামে জাহেলিয়াতের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত সেই আরব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করলেন। শত্রুকে ভাই বানিয়ে দিলেন। মানুষ উটের পিঠে খাবার বোঝাই করে নিয়ে ঘুরতো দান করার জন্য, নেওয়ার মতো কোন লোক ছিল না। আদালতে মাসের পর মাস অপরাধ সংক্রান্ত কোনো মামলা আসতো না। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সামরিক শক্তিতে, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিতে আমরা ছিলাম শিক্ষকের জাতি।

অথচ আজ আমরা ১৫০ কোটি। আমাদের লক্ষ লক্ষ আলেম, লক্ষ লক্ষ মসজিদ-মাদ্রাসা, মুফাস্সির-মোহাদ্দিস, লক্ষ লক্ষ লোক আমরা একত্রিত হই পবিত্র মক্কায়, লক্ষ লক্ষ লোক আমরা জমায়েত হই তুরাগ নদীর পাড়ে। আর আজ যখন জাতি আক্রান্ত হয়, আমরা ভয়ে আতঙ্কে যেন কাঁপতে থাকি। আমি সেই পথভ্রষ্টদের প্রশ্ন করি, আজ আপনারা কোন্ ইসলাম মানবজাতিকে শিক্ষা দিতে চান? ভয়ে মানুষ পথ চলতে পারে না। এটা কি আল্লাহর রসুলের সেই ইসলাম? কখনোই নয়।

আরেকটা ঘটনা বলি, একদিন মদিনায় একটা প্রচণ্ড আওয়াজ হলো। জনগণ ভীত-কম্পিত হলেন। আমার রসুল (সা.), রাহমাতাল্লিল আলামিন বললেন, 'তোমরা ভয় পেয়ো না। কিসের আওয়াজ আমি একটু দেখি।' একা তিনি ঘোড়া নিয়ে বের হলেন। সমস্ত মদিনা চক্কর দিয়ে আসলেন। বললেন, 'কই কিছুই তো হয় নি। তোমরা নির্ভয়ে থাক, নিশ্চিন্তে থাক।' যিনি মানব জাতিকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। আজকে তাঁর নাম নিয়ে, তাঁর অনুসারী দাবি করে দুনিয়াময় তাণ্ডব চালানো হচ্ছে। এটা কি আল্লাহর রসুলের (সা.) ইসলাম? না। আল্লাহর রসুলের (সা.) ইসলামের উদ্দেশ্য ছিল শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। উপরের দু'টি উদাহরণই তা বোঝার জন্য যথেষ্ট।

আক্রান্ত হয় সাধারণ মানুষ, ভাবতে হবে সাধারণ মানুষকেই:

তুরস্কে হামলা হলো। সাধারণ মানুষ নিহত হলো। কিছুদিন আগে পাকিস্তানে একটা হাসপাতালে হামলা করা হলো, সাধারণ মানুষ নিহত হলো। আমাদের বাংলাদেশেও হলি আর্টিজনে হামলা করা হলো, সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হলো। অথচ এই সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দেয়াই ছিল ইসলামের শিক্ষা। নির্দোষ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে জান্নাত পাওয়া যায় না। এই কথাটা আজকে বুঝতে হবে সবাইকে।

আমাদের সরকার, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সন্ত্রাস নির্মূলের চেষ্টা করছে। গোয়েন্দা তথ্যও সরবরাহ করছেন। তারা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করছেন। নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছেন। কিন্তু আমাদের জনগণকে বুঝতে হবে এটা শুধু সরকারের সঙ্কট নয়। এই সঙ্কট শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীই মোকাবেলা করবে এই আশা করাটাও ঠিক নয়। কারণ প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'এটা একটা বৈশ্বিক সঙ্কট। সমস্ত বিশ্বময় এই সঙ্কট সৃষ্টি করা হচ্ছে। একটা বিরাট টার্গেট তাদের রয়েছে।' কাজেই এই বৈশ্বিক সঙ্কট মোকাবেলা করতে হলে আমাদের জনগণকেও বুঝতে হবে এই সঙ্কটের গোড়া কোথায় এবং জনগণের কী দায়িত্ব রয়েছে? জনগণ যদি স্বার্থপর হয়, জনগণ যদি আত্মকেন্দ্রিক হয় তাহলে সমাজ থাকে না, রাষ্ট্র থাকে না। তার প্রমাণ হচ্ছে সিরিয়া।

জনগণকে কয়েকটি মৌলিক বিষয় জানতে হবে। কারণ যারা জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড করছে তারা ইসলামের নামে এগুলি চালিয়ে দিচ্ছে। এতদিন বলা হতো মাদ্রাসা থেকে জঙ্গি হচ্ছে। এখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও জঙ্গি হচ্ছে। এতদিন বলা হতো গরীব ঘরের সন্তানরা অর্থের লোভে জঙ্গি হচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে ধনীর দুলালরা যাদের কোনো অর্থ-সম্পদের অভাব নেই তারাও জঙ্গি হচ্ছে। এর কারণ কী? আসল কারণ হচ্ছে মানুষের ঈমান, মানুষের ধর্মবিশ্বাস। এজন্য সমস্ত আলেমরা একমত ছিলেন, আকিদা যদি ভুল হয় তাহলে ঈমানের কোন মূল্য থাকে না।

রাজধানীর সূত্রাপুরে বিশাল জনসভায় উপস্থিত হাজারো জনতা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

আকিদা-ঈমান-আমলঃ

তিনটি বিষয় আমাদেরকে বুঝতে হবে- ১. ইসলামের প্রকৃত আকিদা (Comprehensive concept), সম্যক ধারণা, সামগ্রিক ধারণা। ২. ঈমান। ৩. আমল।

আমরা মসজিদ নির্মাণ করছি, নামায পড়ছি, হজ্জ করছি, যাকাত দিচ্ছি। এগুলি সব আমল। আমলের পূর্বশর্ত হচ্ছে ঈমান। সেই ঈমান কী? "লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ (সা.)'- আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারও হুকুম মানবো না এবং মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রসুল।" আল্লাহর হুকুম মানে হলো যাবতীয় অন্যায়কে প্রত্যাখ্যান করা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ কলেমার মর্মার্থ হলো- যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ন্যায়ের পক্ষে আমি ঐক্যবদ্ধ হবো। যারা এই কলেমার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবে তারা হবেন মো'মেন। এই মো'মেনের নামায, রোজা, হজ, যাকাত আল্লাহর কাছে কবুল হবে। ঈমানেরও আগে রয়েছে আকিদা। সেই আকিদা হলো সামগ্রিক ধারণা। ইসলাম কী, কেন, কীভাবে? আল্লাহর রসুল (সা.) কেন এসেছেন? কিতাব নাযিলের কারণ কী? রসুলপাক (সা.) একটি জাতি তৈরি করলেন কেন? এই জাতি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব কীভাবে পালন করবে এটা সামগ্রিক জানার নাম হচ্ছে আকিদা। সেই আকিদা ভুলের কারণে আজকে ঈমানদার মানুষের ঈমানকে হাইজ্যাক করে নিয়ে ভুলখাতে প্রবাহিত করে, জাতিবিনাশী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা হচ্ছে। এজন্য সর্বপ্রথম ধর্মপ্রাণ মানুষের ঈমানকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার জন্য, মানবজাতির কল্যাণে ব্যবহার করার জন্য তাদেরকে ইসলামের প্রকৃত আকিদা শিক্ষা দিতে হবে।

টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারের সন্তান এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মাদ বায়াজীদ খান পন্নী এই মহাসত্য আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আজ আমাদের হৃদয় উন্মুক্ত, দৃষ্টি প্রসারিত। আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায়, কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম, কোনটা বৈধ, কোনটা অবৈধ। ইনশাল্লাহ আর আমাদের ঈমানকে কোন শক্তি হাইজ্যাক করে নিয়ে মানবতার ক্ষতি হয় এমন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত করাতে পারবে না। জনগণকেও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা দিতে হবে। দেশের প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, 'এখন জনগণকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা দিতে হবে।' তাহলে এই জঙ্গিরা আমাদের সমাজে আর জায়গা পাবে না। আর সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি আমার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ নিয়ে ষড়যন্ত্র করে সফল হতে পারবে না।

দেশ রক্ষায় ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবেঃ

পরাশক্তিদের কোন ধর্ম নেই। তারা চায় শুধু অর্থ। তাদের হচ্ছে যুদ্ধ ভিত্তিক অর্থনীতি (War Economy)। এ কারণে তাদের নতুন নতুন যুদ্ধক্ষেত্র লাগবে। তা না হলে তাদের অর্থনীতি সচল থাকবে না। অতি কষ্ট করে, সংগ্রাম করে ১৯৭১ সালে এ দেশের বীর জনতা এই ভূখণ্ড স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন। আজ যদি পায়ের নিচে আমাদের এই মাটিটুকু না থাকে তাহলে দাঁড়ানোর কোনো জায়গা থাকবে না। এই মহাসত্য আজ ১৬

কোটি বাঙালিকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করতে হবে। সমস্ত বিশ্ব আজ টালমাটাল, যুদ্ধের দামামা বাজছে। এই মাটিতে আমরা সেজদাহ করি। এই মাটিতে আমাদের পূর্ব পুরুষের রক্ত, অস্থি, মজ্জা মিশে আছে। এ মাটির ফসল খেয়ে আমরা বড় হয়েছি। তাই এই মাটিকে রক্ষা করা এখন আমাদের ঈমানী দায়িত্ব, নাগরিক কর্তব্য।

ধর্মব্যবসা ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাদের বহু কোরবানি দিতে হয়েছেঃ

আমরা হেযবুত তওহীদ আন্দোলন এমামুয্যামানেরর অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে মাঠে-ময়দানে, এই সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। এই মহাসত্য বলার কারণে, আমরা আক্রান্ত হয়েছি। আমাদের বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে। এ পর্যন্ত চারজন ভাইকে হত্যা করা হয়েছে। বাড়িঘর লুটপাট করে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা বলেছি তোমরা আমাদের যত ক্ষতি কর, আমরা বেঁচে থাকতে বাংলাদেশকে সিরিয়া-ইরাক-আফগানিস্থানের মতো হতে দিব না। ঐ জঙ্গিবাদীদেরকে, ঐ ধর্মব্যবসায়ীদেরকে, ধর্মের নামে যারা অপরাজনীতি করছে তাদেরকে, পরিষ্কার বলতে চাই, তোমরা দুনিয়ার মানুষকে হত্যা করেও যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবা ওটা আল্লাহ-রসুলের ইসলাম নয়। তোমরা মানবজাতিকে শান্তি দিতে পারবে না। কারণ তোমাদের পথ ভুল। ঐ পথে গিয়ে তোমরা আল্লাহকেও হারাবে, রসুলকেও (সা.) হারাবে। মানবতার বিনাশ করে দিয়ে আল্লাহকে পাওয়া যায় না। মানুষকে রক্ষার মধ্য দিয়েই আল্লাহকে পাওয়া যায়। সমস্ত নবী-রসুলগণ এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আমার রসুলকে (সা.) তায়েফের ময়দানে পাথরের আঘাতে আঘাতে যখন জর্জরিত করা হলো তখন মালায়েক (ফেরেস্তা) এসে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ (সা.), আপনি অনুমতি দিন, দুই পাহাড়ের মাঝখানে রেখে এই অবাধ্য কওমকে বিনাশ করে দেই। আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন, না, তাদেরকে বিনাশ করে দিলে তাদের উত্তর পুরুষ হেদায়াহ পাবে কী করে? তিনি রহমতের নবী, তিনি দয়ার নবী, তাঁর টাইটেল দিয়েছেন আল্লাহ- রাহমাতাল্লিল আলামিন, সমস্ত বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ।

নিপীড়িত মানুষকে রক্ষা করাই আমাদের ইবাদতঃ

পৃথিবীর ঐ প্রান্তে কোনো মানুষ যদি অত্যাচারিত হয়, লাঞ্ছিত হয়, নিপীড়িত হয়, প্রত্যেক উম্মতে মোহাম্মদীর কর্তব্য রয়েছে সেই নিপীড়িত মানুষকে রক্ষা করা। সেই মানুষ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, নাস্তিক ইত্যাদি যাই হোক না কেন। তাকে রক্ষা করা আমাদের ইবাদত। তাকে রক্ষা করা আমাদের উপরে রসুলের (সা.) দেওয়া দায়িত্ব। সমস্ত মানবজাতি যখন শান্তি, ন্যায় এবং সুবিচারের মধ্যে থাকবে তবেই তো আমার রসুল (সা.) হবেন রাহমাতাল্লিল আলামিন। আর আজ সারা পৃথিবীতে তোমরা তো গজব স্বরূপ নাজেল হয়েছ। তোমরা আফগানিস্থানে গিয়েছ, আফগানিস্থান ধ্বংস হয়ে গেছে; ইরাকে গিয়েছ, ইরাক ধ্বংস হয়ে গেছে; সিরিয়ায় গিয়েছ, সিরিয়া ধ্বংস হয়ে গেছে, লিবিয়া ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন তোমরা আমার প্রিয় জন্মভূমির এই এক টুকরা মাটিকে টার্গেট করেছো? এখানে হেজবুত তওহীদ রয়েছে। ইনশাল্লাহ, তোমরা এখানে সফল হবে না, কখনো না।

যে কারণে আমরা আশান্বিতঃ

সিরিয়ার জনগণ তাদের দেশ রক্ষা করতে পারেনি। ইরাকের জনগণ দেশ রক্ষা করতে পারেনি। আফগানিস্থানের জনগণ দেশ রক্ষা করতে পারেনি। ঐ দেশগুলির সঙ্গে আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশের বিরাট একটা পার্থক্য রয়েছে। সেটা হলো- ওই মানুষগুলি সঠিক পথের দিশা পায়নি, মুক্তির পথ পায়নি, ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোনো রাস্তা খুঁজে পায়নি। কিন্তু আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তির পথ পেয়ে গেছি। এই বাংলার মাটিতে সত্য এসে গেছে। হেদায়াহ এসে গেছে, কাজেই এখন আমার দেশের সাধারণ মানুষকে সত্য-ন্যায় দ্বারা সঠিক পথের মাধ্যমে যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ করতে পারি ইনশাআল্লাহ আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের উপর কেউ একটা আঁচড় দিতে পারবে না।

আল্লাহকে নিয়ে রাজনীতি চলবে নাঃ

জাতীয় সংকট নিয়ে কোনো রাজনৈতিক খেলা চলে না। ধর্মকে নিয়ে পলিটিক্স চলে না। ধর্ম আগে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। বাস্তব জীবনে ধর্মের প্রয়োগ ঘটাতে হবে। তবেই আল্লাহ এই মানুষকে শান্তি দিবেন। এই সংকট অত্যন্ত ভয়ংকর সংকট। এই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আর একটি শর্ত আছে। সেটা হলো এই, জাতির মধ্যে ঐক্য বিনষ্টকারী কোনো ব্যবস্থা রাখা যাবে না। যে রাজনৈতিক সিস্টেম আমার জাতির মধ্যে ঐক্য নষ্ট করে, পারস্পরিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে, শত্রুতার সৃষ্টি করে, যেই শিক্ষাব্যবস্থা জাতির মধ্যে ঐক্য নষ্ট করে, যেই সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা জাতির

মানুষের মনের মধ্যে বিভাজনের সৃষ্টি করে, যেই সমাজ ব্যবস্থা প্রতিবেশির মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করে সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। কারণ, এখন জাতির সামনে ইস্পাতকঠিন একটা ঐক্যের প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে বলেছেন, সীসা গলানো প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হতে। কাজেই ঐক্য বিনষ্টকারী সমস্ত ব্যবস্থাকে বন্ধ করতে হবে। প্রকৃত ইসলাম থেকে সরে যাওয়াও ঐক্য বিনষ্টের অন্যতম কারণ।

ধর্মগুলো কেন আবেদন হারালো:

কার্ল মার্কস, লেনিন, স্টালিন, মাওসেতুং, আব্রাহাম লিংকন, রুশো, ম্যেকিয়াভেলি প্রমুখ দার্শনিকদেরকে বলা হচ্ছে কাফের, তাদের গ্রন্থগুলিকে বলা হচ্ছে কুফরি, মুসলিমদের এগুলি দেখা হারাম, এগুলি নিয়ে চিন্তা করা হারাম। তাদের গ্রন্থ পড়া হারাম কি হারাম না, তারা কাফের কি কাফের না সে বিষয়ে আমি যাব না। আমার কথা হলো- আমেরিকার সাধারণ মানুষ যখন অত্যাচারে-নির্যাতনে নিষ্পেষিত হচ্ছিল, রাশিয়ার কোটি কোটি বঞ্চিত শ্রমিক, কৃষক, জনতা যখন বঞ্চিত হচ্ছিল, তাহীসুরে চিৎকার করছিল, ফ্রান্সের সাধারণ জনগণের যখন স্বাধীনতা ছিল না, একদিকে রাজার অত্যাচার অন্যদিকে ধর্মগুরুদের অবিচারের যাতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছিল, চীনের কোটি কোটি বঞ্চিত মানুষ যখন আত্মহারা হচ্ছিল মুক্তির নেশায় তখন হে উম্মতে মোহাম্মদী, হে ধার্মিক তোমরা কোথায় ছিলে? তোমরা মসজিদে ছিলে? তোমরা মাদ্রাসায় ছিলে? তোমরা বসে বসে জায়েয-নাজায়েযের, সওয়াব-গোনাহের কেতাব রচনা করেছ? সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছ? আর তোমাদের সুলতানরা, তোমাদের তথাকথিত সম্রাটরা ভোগ-বিলাসে তখন নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছে। তোমরা তখন বঞ্চিত জনতার মুক্তির জন্য কেন গেলে না সেখানে? এজন্য মানুষ সেদিন বিপ্লব করেছে রাশিয়ায়। সমাজতন্ত্রকে আলিঙ্গন করে নিয়েছে মুক্তির নেশায়। মুক্তির নেশায় গণতন্ত্রকে আলিঙ্গন করে নিয়েছে আমেরিকার মানুষ। বিপ্লব করে চীনের কোটি কোটি মানুষ আলিঙ্গন করে নিয়েছে সমাজতন্ত্র। তারা যখন একটা মতবাদ আলিঙ্গন করে নিয়েছে তখন তাদের কাছে তোমার ধর্মের আর কোনো আবেদন নাই। এটা কালে-কালে যুগে-যুগে সত্য হয়েছে। তোমরা কেন গিয়ে একথা বললে না? হে কৃষক, শ্রমিক, বঞ্চিত জনতা! দেখ, যেই কাবার সামনে আমরা সেজদাহ করি সেই কাবার উপরে আমার রসুল (সা.) নির্যাতিত নিপীড়িত বেলালকে (রা.) উঠালেন। যিনি ইসলামপূর্ব যুগে কৃতদাস ছিলেন সেই বেলালকে (রা.) আমার রসুল (সা.) কেমন মর্যাদা দিয়েছেন, সম্মান দিয়েছেন! আমরা এমন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছি, এমন সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছি, আমাদের খলিফা পিঠে খাবার বোঝাই করে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরতেন। তার কোনো ব্যক্তিগত পাহারাদার ছিল না। আমরা এমন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছি- একা একটা মেয়ে মানুষ রাতের অন্ধকারে হেঁটে যাবে কোন ভয় থাকবে না। তোমরা এই মুক্তির বাণী, এই সাম্যের বাণী, এই মুক্তির গান নিয়ে কেন সেখানে গেলে না? যখন তোমরা যেতে ব্যর্থ হয়েছ তখন তোমাদের ধর্ম তাদের কাছে আবেদন হারিয়েছে।

কাজেই এখন আর রাগ করে, শত্রুতা করে কোনো লাভ নেই। প্রায় আটশো কোটি মানুষ তাদেরকে তাদের জাতীয় জীবন বিধাতা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। এখন সময় হয়েছে প্রকৃত ইসলামের অনাবিল রূপকে মানুষের সামনে তুলে ধরার, এই দায়িত্ব পালন করতে হবে মো'মেনদের। এটাই এখন তাদের মুখ্য কর্তব্য। কাজেই মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করতে হবে। আমরা কোথায় পথ হারিয়েছি? কোথায় ভুল করেছি? কেন আমাদের মানুষগুলি এমন দিশেহারা, কেন আমরা আজ পথ পাচ্ছি না? কেন আমাদের সর্বত্র আজ আতঙ্ক-ভয়? একটু ভাবুন, দেখবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ মুক্তির পথ অবশ্যই দেখাবেন।

হেযবুত তওহীদ কী বলে তা ভালোভাবে জানুন:

আপনারা হেযবুত তওহীদ আন্দোলন সম্পর্কে ভাল করে জানুন। না জানার কারণে গত একুশ বছর থেকে আমাদের বিরুদ্ধে বহু অপপ্রচার চালানো হয়েছে। আমরা প্রকৃত ইসলামের কথা বলছি, মানবজাতির মুক্তির কথা বলছি। আমরা যখন বলি রসুল (সা.) সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার মতো একটা জীবনব্যবস্থা দিয়ে গেলেন কিন্তু সেই দীনকে আজ বিকৃত করে ফেলা হয়েছে, এজন্য ইসলাম আর সমাজে শান্তি দিচ্ছে না তখন আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হয়েছে যে আমরা নাকি ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলছি।

আলহামদুলিল্লাহ, এখন অনেকেই বুঝতে পারছেন যে, হেযবুত তওহীদ যেটা বলছে এটাই সত্য। আমাদের কোনো অর্থনৈতিক স্বার্থ নাই। আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে সুরা বাকারার ১৭৪ নাম্বার আয়াতে বলেছেন, "যারা আমার আয়াত গোপন করে এবং তার বিনিময়ে পার্থিব মূল্য গ্রহণ করে

রাজধানীর সূত্রাপুরে হেযবুত তওহীদ কর্তৃক আয়োজিত সন্ত্রাসবাদ বিরোধী জনসভা শেষে হাজারও জনতা র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে।

তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই প্রবেশ করায় না। আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।" ধর্মের কোনো বিনিময় চলে না। ধর্মের কাজ চলবে আল্লাহর জন্য।

ধর্ম কী:

ধর্ম হলো শক্তি, গুণ, বৈশিষ্ট্য। আগুনের ধর্ম কি? পোড়ানো। আগুন যদি তার পোড়ানোর ক্ষমতা হারায় সে ধর্মহীন হলো। মানুষের ধর্ম কী? মানুষের ধর্ম হলো মানবতা। অন্য মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, কষ্ট দেখার পর সেই দুঃখ নিজ হৃদয়ে ধারণ করবে তারপর তার দুঃখ নিবরণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন, তিনি হলেন ধার্মিক। আজকে সমস্ত দুনিয়াময় ধার্মিকরা, আপনারা কেউ আরবীয় লেবাস ধরে, কেউ গেরুয়া বসন পরে, কেউ মন্দিরে গিয়ে, মসজিদে গিয়ে, কেউ গীর্জায় গিয়ে ভাবছেন আল্লাহকে, ভগবানকে, ঈশ্বরকে পেয়ে গেছেন? জান্নাতে যাবেন, স্বর্গে যাবেন, হ্যাভেনে যাবেন? মানবতা যখন বিপর্যস্থ, মানুষ যখন ত্রাহী সুরে চিৎকার করে, মানুষকে সমাজে শান্তি না দিয়ে কারো কোনো ধর্ম পরিচয় থাকতে পারে না, এই ধর্ম পরিচয় অর্থহীন। কেন না ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাই হচ্ছে মানুষের শান্তির জন্য, মানুষের মুক্তির জন্য কাজ করা। এজন্যই সমস্ত নবী-রসুলগণ, সমস্ত অবতারগণ, মহামানবগণ এই লক্ষ্যে সংগ্রাম করে গেছেন। আজ সারা দুনিয়াময় মানবতা বিপর্যস্থ। এই মানুষকে রক্ষার জন্য আপনারা এগিয়ে আসুন। তাহলে আপনারা হবেন ধার্মিক, আপনারা হবেন মো'মেন, আপনারা হবেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা। আপনাদের জন্য জান্নাত-স্বর্গ-হ্যাভেন রয়েছে।

রাজনীতি করুন মানুষের কল্যাণে:

ধর্মের নামে যেমন স্বার্থ চলে না তেমনি রাজনীতির নামেও কোন স্বার্থ চলে না। আল্লাহ যাকে শক্তি দিয়েছেন, মেধা দিয়েছেন, অর্থ দিয়েছেন তিনি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে রাজনীতি করবে মানবতার কল্যাণে। নিজের ঘরে খাবেন, নিজের টাকায় টেলিফোন ব্যবহার করবেন, নিজের টাকা দিয়ে গাড়ির তেল পোড়াবেন আর মানবতার কল্যাণে ভূমিকা রাখবেন। আপনি হবেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা। হাশরের দিন এ রাজনীতি আপনাকে জান্নাতে নিবে। বংশ পরম্পরায় আপনার জন্য মানুষ দোয়া করবে। আজ দুনিয়াময় চলছে স্বার্থের

রাজনীতি। বর্তমান রাজনীতিতে নীতি-নৈতিকতার কোনো হিসাব নেই, ন্যায়-অন্যায়ের কোনো বোধ নেই, সত্য-মিথ্যার কোনো বালাই নেই। স্থানীয় একটা চেয়ারম্যান পদের জন্য নিজের দলের লোকদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। এ রাজনীতির জন্য হাশরের দিন আল্লাহর কাছেও জবাবদিহি করতে হবে।

এখন বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের এই সঙ্কট ভয়ানক আকার ধারণ করেছে। এই যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে স্বার্থের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। সেই রাজনীতিকদের আমরা চাই যারা দেশের মানুষের জন্য, দেশের মাটির জন্য জীবন দিবেন। এখন থেকে ধর্মের নামে কোনো স্বার্থ উদ্ধার চলবে না। আর রাজনীতির নামেও কোনো স্বার্থ চলবে না। ধর্ম এবং রাজনীতি হবে মানবতার কল্যাণে। তবেই দেশ বাঁচবে, ধর্ম বাঁচবে, সমাজ বাঁচবে, সবকিছু বাঁচবে।

নতুন সভ্যতার সুসংবাদঃ

আমরা যুগসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি। একটা যুগের বিনাশ হবে আর একটা যুগের শুরু হবে। কাজেই এই নবযুগের সূচনালগ্নে আমি সত্যবাদী জনতাকে স্বাগত জানাই। যারা সত্যকে ধারণ করবেন, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবেন, ইনশাল্লাহ তাদের কর্মের বিনিময়ে সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা হবে। এটাই পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ বলেছেন- তারাই সত্যনিষ্ঠ মো'মেন।

বর্তমানে মো'মেনদের কর্তব্যঃ

আমাদের প্রত্যেকটা কর্ম, প্রত্যেকটা আমল যেন হয় ইহকাল এবং পরকাল দুই কালকে সামনে রেখে। আসুন আমরা আমাদের দুনিয়াকে সুন্দর ও শান্তিময় করি। আমরা আমাদের জন্মভূমিকে বাসযোগ্য করি। যেখানে কোনো ভয় থাকবে না, কোনো আতঙ্ক থাকবে না। সেই সম্ভাবনার প্রস্তাব করে যাচ্ছে হেযবুত তওহীদ। আল্লাহ বলেছেন, "কুল্লি মু'মিনিনা ইখয়াতুন। সমস্ত মো'মেন তো ভাই ভাই।" আমরা ভাই, অন্যের সম্পদ পাহারা দেয়া আমার কর্তব্য। আমার ভাই আমার থেকে নিরাপদ থাকবে। রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, সে কখনও মো'মেন হতে পারবে না যার জিহ্বা এবং হাত থেকে অন্য মো'মেন নিরাপদ নয়। যে পেট পুরে খেল আর তার প্রতিবেশি অভুক্ত থাকলো সে মো'মেন নয়। এখানেই বুঝতে পারছেন ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ, যুদ্ধ-রক্তপাত থাকতে পারে না।

সবাইকে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ন্যায়ের পক্ষে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি, শুধু বাংলাকে নয় এই সত্য দিয়ে আমরা একদিন সমস্ত দুনিয়াকে লীড (নেতৃত্ব) দেব ইনশাল্লাহ।

[গত ২৬ আগস্ট সূত্রাপুরে আয়োজিত জনসভায় প্রদত্ত হেযবুত তওহীদের এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিমের ভাষণ থেকে সংকলিত]

মহাসত্যের আহ্বান

পৃথিবীর ইতিহাস সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্বের ইতিহাস। যখন মানুষের কর্মফলে পৃথিবীতে অশান্তি নেমে এসেছে তখনই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তির বাণী নিয়ে এসেছিলেন নবী-রসুলগণ। আজ সমস্ত পৃথিবীতে যে অশান্তি চলছে তার কারণ আল্লাহর হুকুম অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের অনুপস্থিতি। কিভাবে মানবজাতিকে আবার সত্যের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব, কয়েকটি হ্যান্ডবিলের মাধ্যমে তা তুলে ধরা হয়েছে। সেই হ্যান্ডবিলগুলোর সংকলন এই পুস্তিকাটি।

হেযবুত তওহীদ
মানবতার কল্যাণে নিবেদিত
www.hezbuttawheed.org
01782188237 | 01670174643 | 01711005025 | 01933767725

বিশ্বের প্রধান সমস্যা সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় আমাদের প্রস্তাবনা

মসীহ উর রহমান, আমীর, হেযবুত তওহীদ

সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে হেযবুত তওহীদ গত কয়েক বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের প্রধানমন্ত্রীও জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় দল মত পথ নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসার জন্য বারবার আহ্বান করেছেন। হেযবুত তওহীদ দেশব্যাপী যাবতীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একটি আদর্শিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি, সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে শক্তি প্রয়োগ অপরিহার্য হলেও কেবলমাত্র শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই একে নির্মূল করা সম্ভব নয়। কেননা জঙ্গিবাদ কোনো নিছক সন্ত্রাস নয়, এটি একটি আদর্শিক সন্ত্রাস। জঙ্গিবাদ যেহেতু একটি ভ্রান্ত মতাদর্শ (Ideology), কাজেই একে একটি সঠিক ও শক্তিশালী মতাদর্শ দিয়েই মোকাবেলা করতে হবে। আর সেই আদর্শ জাতির সামনে তুলে ধরার জন্যই আমরা এগিয়ে এসেছি। আমাদের এমাম জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম সম্প্রতি জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আয়োজিত বিভিন্ন আলোচনা সভা ও জনসভায় জঙ্গিবাদ নির্মূলে সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সংশ্লিষ্টদের উদ্দেশে কিছু প্রস্তাবনা পেশ করেন। প্রস্তাবনাগুলোর বিষয়ে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা বিশ্বাস করি, জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় এই প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই।

প্রস্তাবনা-১:

সমস্ত জাতিকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা দিতে হবে

আজকে এটা বাস্তবতা যে আল্লাহর রসুল (সা.) পৃথিবীতে যে ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন তা সহস্রাধিক বছরের বিকৃতির নিচে চাপা পড়ে গেছে। প্রকৃত রূপ হারিয়ে তা আজ হাজার হাজার রূপ ধারণ করেছে। ইসলামের প্রকৃত রূপ যদি আজ মানুষের সামনে উন্মুক্ত থাকত তবে ধর্মবিশ্বাসী মানুষকে কেউ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যবহার করতে পারত না। জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মানুষের সামনে ইসলামের প্রকৃত রূপটি তুলে ধরা। এই শিক্ষা পেলে সাধারণ মানুষ ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝবে, ধর্ম কাকে বলে, ইসলাম কী ও কেন, আল্লাহর রসুল কী লক্ষ্যে সংগ্রাম করেছিলেন, মানুষের প্রকৃত ইবাদত কী, কোনটা জেহাদ আর কোনটা সন্ত্রাস প্রভৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখবে। মানুষ যখন দীন বা ধর্ম সম্পর্কে পরিষ্কার আকিদা (Comprehensive Concept) ধারণ করবে তখন তাদেরকে বিপথে পরিচালিত করা সম্ভব হবে না। আর যতদিন প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মানুষকে দেওয়া না হবে, ততদিন তারা বারবার স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী দ্বারা ব্যবহৃত হবে এবং জঙ্গিবাদের ন্যায় বৃহৎ সংকট সৃষ্টি করবে।

জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যখন আদর্শিক মোকাবেলার প্রশ্ন উঠল তখন কেউ বলছেন একে সংস্কৃতি দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। কেউ বলছেন গণতন্ত্র দিয়ে, কেউ বলছেন সমাজতন্ত্র দিয়ে, কেউ বলছেন সাম্যবাদ দিয়ে, কেউ বলছেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দিয়ে। আমরা সকলের বিশ্বাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বলতে চাই, জঙ্গিবাদের জন্ম হয়েছে ধর্মবিশ্বাস থেকে। বিশ্বের ১৬০ কোটি মুসলিম আল্লাহকে বিশ্বাস করে। তারা কোরআনে বিশ্বাস করে, আল্লাহ ও তার রসুলকে ভালোবাসে। তাদের এই ধর্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে, মানুষের ঈমানের দোহাই দিয়ে, কোরআনের আয়াত বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে, আল্লাহর রসুলের জীবনের দুয়েকটি ঘটনাকে খণ্ডিতভাবে উপস্থাপন করে, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সন্তুষ্টির মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে, মানবতাবিনাশী কার্যের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। সমস্যা যেহেতু ধর্ম থেকে উদ্ভূত, সমাধানও ধর্মের মধ্যেই খুঁজতে হবে। আজ যদি আমরা যুব সমাজের কাছে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরতে পারি, আজ যদি তাদেরকে রসুলের প্রকৃত জীবনাদর্শ তুলে ধরতে পারি, কোর'আনের মর্মবাণী তুলে ধরতে পারি, তবেই কেবল ঈমানদার মানুষেরা তাদের ঈমানকে হেফাজত করতে পারবে।

প্রস্তাবনা-২:

শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন

আজ থেকে প্রায় তিনশ' বছর আগে ইন্দোনেশিয়া থেকে আটলান্টিকের তীর পর্যন্ত সমস্ত মুসলিম বেল্ট ইউরোপীয়ানরা দখল করেছিল। এক সময়ের অর্ধপৃথিবীর শাসক মুসলিম জাতি তখন ইউরোপীয়ানদের গোলাম। মুসলিম জাতি যেন আর কোনোদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে তার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা তখন এক বৃহৎ পরিকল্পনা হাতে নেয়। তারা একটি ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে। একদিকে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা, অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা (General Education)। মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রদান করা হয়নি বরং সেখানে দীনের অতি তুচ্ছ বিষয়াদির

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যেসব মাসলা-মাসায়েল নিয়ে আমাদের আলেমরা ইতোপূর্বেই তর্ক-বাহাসে লিপ্ত ছিলেন, সেগুলোকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হিসেবে সিলেবাসে প্রবেশ করানো হলো। এটা এজন্য করা হলো যেন জাতি প্রকৃত ইসলামের শিক্ষার উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে চিরকাল ধর্ম নিয়ে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত থাকে। মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় তাদের আরেকটি বড় ষড়যন্ত্র ছিল এই যে, সেখানে আয়-উপার্জন করার মতো কোনো ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হতো না। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যারা তাদের প্রবর্তিত মাদ্রাসাগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে বেরিয়ে আসবে তারা যেন এই জ্ঞানকে বিক্রি করে খেতে বাধ্য হয়। তাদের এই সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের ফল হয়েছে এই যে, পুরো জাতিই আজ ইংরেজদের হাতে তৈরি ওই বিকৃত ইসলামের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে গেছে। ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা তাদের সামনে আজ অনুপস্থিত।

অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্তায় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত লোক বের হচ্ছেন। কিন্তু সেখানে ধর্মের কোনো নাম-গন্ধ নাই। মানুষের আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য, তাকে নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, মানবপ্রেম শেখানোর জন্য যে ধর্মের জ্ঞান অপরিহার্য সেই ধর্মীয় শিক্ষা সেখানে বলতে গেলে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সেখানে শিক্ষা হয়ে গেছে এখন অর্থ রোজগারের একটা মাধ্যম। দেশের কৃষক-শ্রমিক-জনতার রক্ত শোষণ করে নিয়ে বিদেশের ব্যাংকে লক্ষ কোটি টাকা পাচার করেছে এই শিক্ষিত লোকেরা। যেখানে শিক্ষিত ব্যক্তিদের হওয়ার কথা অধিকতর দেশপ্রেমিক, সেখানে দেখা যায়- যে যত বেশি শিক্ষিত অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার দ্বারা জাতি তত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এখানে ধর্মের শিক্ষা না পাওয়ায় একটা আত্মিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার এই যে গোড়ায় গলদ অবস্থা এই অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। একজন শিক্ষিত লোক হবেন দেশপ্রেমিক, মানবতাবাদী। তিনি হবেন জাতির কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ। নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি জাতির স্বার্থ রক্ষা করবেন। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন নৈতিক শিক্ষা, সত্যিকারভাবে স্রষ্টাভীতি। ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে এই নৈতিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় একদিকে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে অর্থাৎ পার্থিব আয়-রোজগারের বাস্তব শিক্ষা থাকবে, তেমনি ধর্মের প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে আত্মিক উন্নতির ব্যবস্থাও থাকতে হবে।

প্রস্তাবনা-৩:

সরকারকে ন্যায়ের দণ্ড ধারণ করতে হবে

বলা হয়ে থাকে, ধর্ম যার যার কিন্তু রাষ্ট্র সবার। কিন্তু মনে রাখতে হবে রাষ্ট্রেরও একটা ধর্ম আছে। রাষ্ট্রের ধর্ম হচ্ছে ন্যায়দণ্ড ধারণ করা। রাষ্ট্র সর্বদা থাকবে ন্যায়ের পক্ষে। রাষ্ট্র যখন ন্যায়ের দণ্ড ধারণ করে, সকল স্বার্থান্বেষণ ও পক্ষপাতের ঊর্ধ্বে উঠে ন্যায়বিচার ও সুশাসন নিশ্চিত করে, জনগণ তখন রাষ্ট্রকে নিজেদের আস্থার প্রতীক বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি যদি ন্যায়ের দণ্ড ত্যাগ করে তখন মানুষও হয়ে ওঠে বিক্ষুব্ধ। আর এই বিক্ষুব্ধ জনতাকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রকে বৃহৎ সংকটের দিকে ঠেলে দেওয়া সম্ভব হয়। এটা মানুষের ইতিহাস। তাই মানুষকে ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করার পূর্বশর্ত হিসেবে রাষ্ট্রকে প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি অঙ্গণে ন্যায়ের উপর দণ্ডায়মান হতে হবে তবেই রাষ্ট্র সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার নৈতিক শক্তি পাবে।

প্রস্তাবনা-৪:

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নৈতিক বলে বলীয়ান হতে হবে

আজকে যারা জঙ্গিবাদী তাণ্ডব চালাচ্ছে, তারা এগুলো করছে ইসলামের নামে। তারা বিশ্বাস করে তাদের এই কর্মকাণ্ড আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কারণ হবে। তাই এ কাজ করতে গিয়ে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে তারা প্রস্তুত থাকে। এমতাবস্থায় এই ভ্রান্ত মতাদর্শীয় সন্ত্রাসীদের মোকাবেলা করতে হলে আমাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকেও ঈমানী শক্তি দ্বারা উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সন্ত্রাসীদের মোকাবেলা করতে গিয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও জীবন দিচ্ছেন। তাদের সামনে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করে দিতে হবে যে, তাদের এই আত্মত্যাগ কেবল পেশাগত দায়িত্বের খাতিরে নয়, বরং জাতিকে রক্ষার তাগিদে করতে হবে। যদি তারা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মোৎসর্গ করেন তবে তাদের এই আত্মত্যাগ তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কাছে সম্মানিত করবে, এর জন্য তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে। জঙ্গিবাদীদের কালিমা থেকে ধর্ম ও জাতিকে রক্ষা করা এখন তাদের ঈমানী দায়িত্ব। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা যদি এটা করেন তবে তারা আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে জঙ্গিবাদীদের মোকাবেলা করতে পারবে। আর তারা যদি অন্যায় করতে থাকেন তবে তারা আরেকটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর নৈতিক শক্তি পাবেন না। কাজেই জঙ্গিবাদের মোকাবেলায় এই আত্মিক শক্তি অপরিহার্য। জীবন দিতে প্রস্তুত একদল মানুষকে মোকাবেলা করার জন্য শুধুমাত্র পুলিশের সদস্য সংখ্যা, প্রশিক্ষণ, গোলাবারুদ, আধুনিক প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ানোই যথেষ্ট নয়। পুলিশ তথা নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে হতে হবে দেশ ও জাতি রক্ষায় প্রকৃত আদর্শে উজ্জীবিত একেকজন উৎসর্গীকৃত প্রাণ, ন্যায়ের পক্ষাবলম্বনকারী।

প্রস্তাবনা-৫:

সঠিক আদর্শ প্রচারে গণমাধ্যমকে সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখতে হবে

গণমাধ্যম একটি জাতির দর্পণস্বরূপ। জঙ্গিবাদের

বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে হলে ইসলামের যে প্রকৃত শিক্ষা প্রয়োজন গণমাধ্যমই পারে সেটা সাধারণ মানুষের কাছে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পৌঁছে দিতে। এটা দুঃখজনক যে, বর্তমানে মিডিয়ায় বহু গুরুত্বহীন খবরকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হয় আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ছোট করে প্রচার করা হয়। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, জাতির সঙ্কট সবসময় সমান থাকে না। কোনো একটা রাষ্ট্রে একটা পর্যায় জরুরি অবস্থা (emergency) জারি করা হয়। আজকে দুনিয়াতে ঐরকম জরুরি অবস্থা চলছে। কাজেই এমতাবস্থায় গণমাধ্যমের দায়িত্বও অনেক বেশি। হেযবুত তওহীদ দেশব্যাপী জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যে আদর্শিক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাকে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে, গণমাধ্যম যদি সেই বিষয়গুলোকে মানুষের সামনে তুলে ধরে তবে তা দ্রুততম সময়ের মধ্যে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা আরো বিশ্বাস করি, বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে ধর্মের এই প্রকৃত শিক্ষাই জাতিকে রক্ষা করতে পারে।

জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় আমাদের এই প্রস্তাবনাগুলি বিবেচনা করে দেখার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সবাইকে আহ্বান করছি। আমাদের প্রস্তাবনার মধ্যে যদি কোনো অসংঙ্গতি থাকে, তবে সঠিক তথ্য ও যুক্তি দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করার অনুরোধ রইল। বর্তমানে আমরা এমনই সংকটের মুখোমুখি যে, ঐক্যবদ্ধভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা ছাড়া জাতিকে রক্ষা করার আর কোনো উপায় আমাদের জানা নেই। আমাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে আজকে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, বিভেদ ও বিভক্তির সব পথ বন্ধ করে সম্মিলিতভাবে জাতির অভিন্ন শত্রুকে মোকাবেলা করতে হবে। আমরা হেযবুত তওহীদ সম্পূর্ণ জাতিকে সেই আহ্বানই জানিয়ে আসছি।

দাজ্জালীয় তাণ্ডব ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে মানবজাতিকে

সতর্ক হওয়ার এখনই সময়

সম্প্রতি উত্তর কোরিয়া তাদের পঞ্চম পারমাণবিক বোমাটির পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। পূর্বের বোমাটির পরীক্ষার পর উত্তর কোরিয়া ঘোষণা দিয়েছিল যে তারা আমেরিকাকে বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে দিতে সক্ষম। এমন প্রায় পঞ্চাশ হাজার বোমা বিশ্বের বিভিন্ন পরাশক্তিগুলো মজুদ করে বসে আছে। এদিকে চলছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া। যে কোনো সময় যে কোনো পরাশক্তি হঠকারিতা করে বা যান্ত্রিক ত্রুটির দরুন বা আত্মরক্ষার জন্য প্রতিপক্ষের উপর এই পরমাণু বোমার ব্যবহার করতে পারে। এটা একটি সিদ্ধান্তের ব্যাপার। এমন সিদ্ধান্ত যে মানুষ নিতে পারে তার উদাহরণ আমরা হিরোশিমা-নাগাসাকিতে দেখেছি।

আফ্রিকা জুড়ে যুদ্ধ-রক্তপাত, দুর্ভিক্ষ। মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে রক্তের বন্যা, প্রায় প্রতিটি দেশে কোথাও না কোথাও সহিংস হামলা বা বোমা বিস্ফোরিত হচ্ছে। সেখানকার কোটি কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে যারা প্রায় শতভাগই মুসলিম। সমস্ত দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে ভয় আতঙ্ক ত্রাস। এখানে ওখানে চলছে সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি হামলা। সমস্ত ইউরোপ জুড়ে বেকারত্ব, বর্ণবাদী বিক্ষোভ, সাম্প্রদায়িক ঘৃণা, উদ্বাস্তু সংকট, জঙ্গি হামলা, খুন।

পৃথিবীর মানুষ আজ বিক্ষুব্ধ। বাইরে যত সফলতার অহংকার থাকুক মনের গভীরে মানুষ আজ দেউলিয়া, দিশাহারা। যে কোন দিনের সংবাদপত্র খুলুন, দেখবেন পৃথিবীময় অশান্তি, ক্রোধ, রক্তারক্তি, অন্যায়, অবিচার আর হাহাকারের বর্ণনা। রাষ্ট্রগত ভাবে যুদ্ধ, দলগত ভাবে হানাহানি, ব্যক্তিগতভাবে সংঘাত আর রক্তারক্তির হৃদয়বিদারী বর্ণনা। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে, বিশেষ করে যে সব দেশ এই যান্ত্রিক সভ্যতাকে গ্রহণ করেছে, সেগুলোতে প্রতি বছর খুন, যখম, ডাকাতি, ধর্ষণ, বোমাবাজি আর অপহরণের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। এমন কি বেগুনাহ, নিষ্পাপ শিশুরা পর্যন্ত এই মানুষরূপী শয়তানদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। এক দিক দিয়ে মানুষ যেমন বিজ্ঞানের শিখরে উঠছে অন্য দিক দিয়ে ঠিক তেমনি ভাবে সে সব রকমের অন্যায়ের চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে।

আজ পৃথিবীর চারদিক থেকে আর্ত মানুষের হাহাকার উঠছে- শান্তি চাই, শান্তি চাই। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারে, দরিদ্রের উপর ধনীর বঞ্চনায়, শোষণে, শাসিতের উপর শাসকের অবিচারে, ন্যায়ের উপর অন্যায়ের বিজয়ে, সরলের উপর ধুর্তের বঞ্চনায়, পৃথিবী আজ মানুষের বাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। নিরপরাধ ও শিশুর রক্তে আজ পৃথিবীর মাটি ভেজা। এ অবস্থা বিনা কারণে হয় নি। অন্য কোন গ্রহ থেকে কেউ এসে পৃথিবীতে এ অবস্থা সৃষ্টি করে নি। মানুষ নিজেই এই অবস্থার স্রষ্টা। তাই পৃথিবীতে শান্তির জন্য এত চেচামেচি, এত লেখা, এত কথা, এত শান্তির প্রচার- কিছুই হচ্ছে না। শুধু হচ্ছে না নয়, সমস্ত রকম পরিসংখ্যান (Statistics) বলে দিচ্ছে যে, একমাত্র যান্ত্রিক উন্নতি ছাড়া আর সমস্ত দিক দিয়ে মানুষ অবনতির পথে যাচ্ছে- এবং দ্রুত যাচ্ছে। পরিসংখ্যান বলছে, পৃথিবীর প্রতিটি দেশে খুন, হত্যা, চুরি,

ডাকাতি, রাহাজানি, ধর্ষণ ইত্যাদি সর্বরকম অপরাধ প্রতি বছর বেড়ে চলেছে বরং বেড়ে চলেছে লাফিয়ে লাফিয়ে। এমন কোন দেশ নেই যেখানে অপরাধের সংখ্যা কমছে। এর শেষ কোথায়? এর পরিণতি চিন্তা করে সুস্থ মস্তিষ্ক মানুষ আজ দিশাহারা।

এ সময়টির কথাই রসুলাল্লাহ (সা.) রূপকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আখেরী যামানায় বিরাট বাহনে চড়ে এক চক্ষুবিশিষ্ট মহাশক্তিধর এক দানব পৃথিবীতে আবির্ভূত হবে; তার নাম দাজ্জাল। সে আল্লাহর বদলে নিজেকে মানবজাতির প্রভু (রব) বলে দাবি করবে (বোখারী)। বর্তমানে পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতা তার অপ্রতিদ্বন্দ্বী আসুরিক শক্তিবলে সমগ্র মানবজাতির প্রভুত্ব অর্জন করেছে এবং তার আদেশে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় সমগ্র মানবজাতি চলতে বাধ্য হচ্ছে।

রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, দাজ্জালের সঙ্গে জান্নাত ও জাহান্নামের মত দুইটি জিনিস থাকবে। সে যেটাকে জান্নাত বলবে সেটা আসলে হবে জাহান্নাম, আর যেটাকে জাহান্নাম বলবে সেটা আসলে হবে জান্নাত। যারা তাকে প্রভু বলে মেনে নেবে তাদেরকে সে তার জান্নাতে স্থান দেবে (বোখারী, মুসলিম)। বস্তুবাদী সভ্যতার বাণীবৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে, তার প্রযুক্তি আর চাকচিক্যে মোহিত হয়ে মানবজাতি তাকে বরণ করে নিয়েছে কিন্তু পরিণতিতে সে কী নিদারুণ অন্যায়, অবিচার, অশান্তি ও রক্তপাতে নিমজ্জিত হয়েছে তার আংশিক বিবরণ উপরে দিয়ে এসেছি।

রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, তার কাছে রেযেকের বিশাল ভাণ্ডার থাকবে। যারা তাকে রব বলে মেনে নেবে তাদেরকে সে সেখান থেকে দান করবে। আর যারা তাকে রব বলে অস্বীকার করবে, অর্থাৎ তার আদেশমত চলবে না, তাদের সে তার ভাণ্ডার থেকে দান তো করবেই না বরং তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা (Sanction) ও অবরোধ (Embargo) আরোপ করবে। তার পদতলে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের করুণ পরিণতি নেমে আসবে (বোখারী, মুসলিম)।

মহানবী (সা.) এই দাজ্জালের আবির্ভাবকে আদম (আ.) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য সবচেয়ে গুরুতর ও সাংঘাতিক ঘটনা বলে চিহ্নিত করেছেন (মুসলিম), শুধু তা-ই নয়, এর মহাবিপদ থেকে তিনি নিজে আল্লাহর কাছে পানাহ (আশ্রয়) চেয়েছেন (বোখারী)।

বাইবেলেও দাজ্জালের কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে তাকে পশু (The Beast), মিথ্যা নবী (False Messiah), প্রতারক (Deceiver), যিশুবিরোধী (Anti-Christ), মিথ্যাবাদী (The Lier) ইত্যাদি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সনাতন ধর্মেও দাজ্জালের 'কানা' হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে, বলা হয়েছে 'অন্ধক আসুর'। 'আসুর' অর্থ পরে আগমনকারী এবং 'অন্ধক' অর্থ অন্ধের মতো। হরিবংশ পুরাণে অন্ধক আসুরের বা দাজ্জালের বিষদ বিবরণ রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে "তার একহাজার হাত (সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশালী), হাজার মাথা (বেশি বুদ্ধিশুদ্ধি), দু হাজার পা (ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র অনায়াসে চলার ক্ষমতা), দু হাজার চোখ (সর্বোচ্চ দৃষ্টিক্ষমতাসম্পন্ন) থাকা সত্বেও সেই শয়তান নিজের অহংকারের কারণে অন্ধের মতো চলছিল। সে জন্য সে 'অন্ধক আসুর' নামে বিখ্যাত হয়েছে।

বর্তমান যুগটিকে সনাতন ধর্মে বলা হয়েছে ঘোরকলি, ইসলামে বলা হয়েছে আখেরি যামানা, বাইবেলে বলা হয়েছে The Last Hour যা চরম অন্যায় অশান্তিতে, পাপে পঙ্কিলতায় পূর্ণ থাকবে।

আজ সময় হয়েছে মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সকল নবী রসুলদের ভবিষ্যদ্বাণীকৃত এই দাজ্জালকে চিহ্নিত করা। এই পশ্চিমা বস্তুবাদী, আত্মাহীন সভ্যতা চায় বিত্ত, ন্যায়-অন্যায় তাদের বিবেচ্য নয়। তাদের ৬২ জনের কাছে পৃথিবীর অর্ধেক সম্পত্তি। তাদের কোনো ধর্ম নাই, কোন মানবতাবোধ নাই। তারা চায় যুদ্ধ আর নতুন নতুন রণক্ষেত্র। নতুন নতুন মারণাস্ত্র তারা উদ্ভাবন করছে মানুষ হত্যার জন্য, সেগুলো বিক্রি করার জন্য প্রয়োজন যুদ্ধ বাঁধানো। কত দেশ ধ্বংস হলো, কত মানুষ খুন হলো, কত মানুষ উদ্বাস্তু হলো সেটা তাদের চিন্তার কোন বিষয় না। কারণ তারা তো বহু আগেই মানুষের সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে গেছে।

এই পশ্চিমা বস্তুবাদী ধর্মহীন 'সভ্যতা'-কে দাজ্জাল হিসাবে প্রমাণ করেছেন মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মো. বায়াজীদ খান পন্নী। তিনি এ বিষয়ে বই লিখেছেন যা ২০০৮ সনে বাংলাদেশে বেস্ট সেলার হয়েছিল। কিন্তু এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী ধর্মব্যবসায়ী মানুষকে এই দাজ্জালকে চিনতে দেয় নি। তারা অপেক্ষা করে আছে সেই এক চক্ষু দানবের যে বিরাট ঘোড়ায় চড়ে আসবে। মানুষকেও তারা সেই অপেক্ষায় বসিয়ে রেখেছেন। অথচ সকল নবী-রসুল-অবতারদের ভবিষ্যদ্বাণীর সেই দাজ্জাল ৪৭৯ বছর আগেই জন্ম নিয়ে তার শৈশব কৈশোর পার হয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে সারা পৃথিবীকে পদানত করে রেখেছে। এটাকেই আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন যে দুনিয়াটিকে একটি চামড়ার বলের ন্যায় আবৃত করে হাতে রাখবে। এই দানবের অত্যাচারে মুসলিম জাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে গেছে। কোটি কোটি মানুষ গত শতাব্দীর দুটো বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে, আর এই শতাব্দীতেই কয়েক মিলিয়ন মানুষকে সেই দানব হত্যা করেছে। কতগুলো মুসলিম প্রধান দেশকে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। এখন মানবজাতির প্রথম কাজই হচ্ছে এই ভয়াবহ শত্রুকে সঠিকভাবে চেনা এবং একে প্রতিরোধ করা, দাজ্জালের মোহময় প্রতারণার দর্শন ত্যাগ করে ন্যায় ও সত্যের উপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে বৈধ পথে সংগ্রাম করা। দাজ্জাল ইহুদি নয়, খ্রিষ্টান নয়, হিন্দু নয়, মুসলিম নয়, বৌদ্ধ নয়। দাজ্জালের কোনো ধর্ম নেই। সে ধর্মহীন একটা ভোগবাদী, বস্তুবাদী সভ্যতা(!)। তার কাজই হলো মানুষের জীবন থেকে সকল ধর্মকে ঝেটিয়ে বিদায় করে দিয়ে সমাজে চরম অন্যায়, অশ্লীলতা, অর্থনীতিক অবিচার প্রতিষ্ঠা করা।

ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিল্পকলা এক সূত্রে গাঁথা

শেখ মনিরুল ইসলাম

আমাদের সমাজ, আমাদের দেশ এক ঘোরতর সংকটে নিমজ্জিত। আমাদের অমূল্য সম্পদ ধর্মবিশ্বাস অর্থাৎ ঈমানকে একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বার বার ভুলপথে প্রবাহিত করে একাধারে ধর্মকে কালিমালিপ্ত করছে ও জাতির অকল্যাণ সাধন করছে। তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সরলপ্রাণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তির আশায় ধর্মের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে না ব্যক্তি উপকৃত হয়েছে, না জাতি উপকৃত হয়েছে, এর দ্বারা ধর্মবিশ্বাসী মানুষগুলো ইহকাল ও পরকাল-উভয়জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ধর্মব্যবসায়ীদের অযৌক্তিক সব কর্মকাণ্ডের কারণে দুর্নাম হচ্ছে ধর্মের। এক শ্রেণির মানুষ ধর্মের নামে এসব অন্ধত্ব দেখে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখছেন, তারা ধর্মকেই অচল, অপ্রয়োজনীয়, পরিত্যাজ্য বলে প্রচারণা চালাচ্ছেন।

আমাদের ধর্মবিশ্বাস অর্থাৎ ঈমান আমাদের একটা শক্তিশালী চেতনা, জাতীয় সম্পদ; আমরা এই শক্তিতে বলীয়ান। এই ঈমানকে দেশ জাতি এবং সমাজের কল্যাণে, জাতির ঐক্য উন্নতি প্রগতিতে কাজে লাগানো সম্ভব। বর্তমানে ধর্ম ও এবাদতের মানে কেবল উপাসনা-আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখায় এ থেকে ধর্মব্যবসায়ীরা লাভবান হলেও জাতি কিছুই পাচ্ছে না। মানুষ কেবল দেহসর্বস্ব প্রাণী নয়, তার একটি আত্মাও আছে। তার কেবল জাগতিক জীবন নয়, একটি পরকালীন জীবনও আছে। কাজেই সকল ধর্মই মানুষের উভয় জগতের কল্যাণ সাধনের জন্যই এসেছে, কেবল দুনিয়া বা কেবল পরকালের জন্য নয়। ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে, রাত জেগে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করা, তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া যেমন সওয়াবের কাজ, তেমনি মানুষ যেন নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে, নির্ভয়ে চলাচল করতে পারে, দুস্কৃতকারীরা ধ্বংসাত্মক কাজ না করতে পারে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করাও বড় সওয়াবের কাজ। এক কথায় মানুষকে সুখ-শান্তি, নিরাপত্তার মধ্যে রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোই মানুষের প্রকৃত এবাদত।

কিন্তু জাতীয়-সামাজিক উন্নয়নের কাজকে আজ ধর্মীয় কাজ বলে কোথাও শিক্ষা দেওয়া হয় না, ধর্মের এ দিকটিকে ঢেকে ফেলা হয়েছে। ধর্মের কোনো বাস্তবমুখী, জীবনমুখী চর্চা আমাদের সমাজে নেই, আছে কেবল সংকীর্ণতা, আত্মকেন্দ্রিক পরকালমুখিতা এবং ধর্মকে ব্যবহার করে সহিংসতা, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ। জাতির ঐক্য নষ্ট করা যে কুফর তা শেখানো হয় না, ষোল কোটি মানুষ প্রায় সকলেই ধর্মবিশ্বাসী হলেও সর্বত্র চলে অনৈক্যের শিক্ষা, অপরের বিষোদগার ও ষড়যন্ত্র করে জয়ী হওয়াই যেন এক শ্রেণির রাজনীতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের লক্ষ্য। আজ কেবল মসজিদে, মাদ্রাসায় দানকেই বলা হয় আল্লাহর রাস্তায় দান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে রাস্তায় মানুষ চলাচল করে সেই রাস্তা নির্মাণের জন্য দান করাও আল্লাহর রাস্তায় দানের অন্তর্ভুক্ত। এই শিক্ষা দেওয়া হয় না। এই শিক্ষা না থাকায় কেউই জাতীয় উন্নয়নের কাজে অংশ নেওয়াকে এবাদত বলে মনে করছেন না। আজ যদি ধর্মের এই প্রকৃত উদ্দেশ্য ও শিক্ষাকে মানুষের সামনে তুলে ধরা যায় তাহলে আমাদের দেশে যে সম্পদের প্রাচুর্য আল্লাহ দান করেছেন, তা দিয়েই আমরা উন্নতির শিখরে পৌছতে পারব। ধর্মবিশ্বাসের মতো এত বড় সম্পদ আজ পচে গলে নষ্ট হচ্ছে। কাজেই ধর্মবিশ্বাস বা ইমানকে অবজ্ঞা করা নয়, খাটো করা নয়, জাতির উন্নয়নে লাগাতে হবে।

ধর্মের অপব্যাখ্যার শিকার হয়েছে আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনও, কারণ তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে সকল প্রকার শিল্প-সংস্কৃতির চর্চাকে নিষিদ্ধ করে রেখেছে। তারা কেবল কিছু নির্দিষ্ট পোশাক, আচার আচরণ, নির্দিষ্ট ভাষা ও সংস্কৃতিকেই অন্য

জাতিগোষ্ঠীর উপরে 'ধর্মীয় সংস্কৃতি' বলে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। অথচ প্রতিটি জাতির মধ্যে ভিন্ন সংস্কৃতি সৃষ্টির পেছনে ধর্মের অবদানই মুখ্য। এটা উপলব্ধি না করে তারা একচেটিয়াভাবে চিত্রাঙ্কন, সিনেমা, নাটক, সঙ্গীত ইত্যাদির চর্চাকে না-জায়েজ বলে ফতোয়া দিয়ে মানবজাতির প্রগতির পথ, সাংস্কৃতিক বিবর্তনের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করতে চাচ্ছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে যে কোনো সুকুমার বৃত্তি যা মানুষের ইতিবাচক মানসিক বিকাশ সাধন করে, মানুষকে আনন্দিত করে, তাকে সৃষ্টিশীল হতে, মানবতার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে তা কোনো ধর্মেই নিষিদ্ধ নয়। ইসলামেও সঙ্গীত, অভিনয়, শিল্প-সাহিত্য, কাব্য কিছুই হারাম নয়, হারাম হচ্ছে অশ্লীলতা, মিথ্যা ও আল্লাহর বিরুদ্ধাচার। ধর্মের চিরন্তন উদ্দেশ্য হচ্ছে শান্তি। যা কিছু মানুষের জাগতিক শান্তির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে সেটাই ধর্মে নিষিদ্ধ, এর বাইরে একটি জিনিসও নিষিদ্ধ নয়। যে কোনো অশ্লীলতার বিস্তার সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি করে এটা সমাজবিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন। তাই কোনো প্রকার অশ্লীলতাকেই ধর্ম বৈধতা দেয় না, সেটা চলচ্চিত্রেই হোক বা পোশাকেই হোক বা সাহিত্যেই হোক। এখন পশ্চিমা অশ্লীল সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের দেশের শিল্পাঙ্গনেও অশ্লীলতা প্রকট আকার ধারণ করেছে। তরুণ সমাজ এর দ্বারা নৈতিক অবক্ষয়ের স্বীকার হচ্ছে।

হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী এই সত্যটি মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি নিজেও ছিলেন শুদ্ধ সংস্কৃতির একজন অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক। রাগ সংগীতে তাঁর ছিল অগাধ জ্ঞান ও দখল। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কীর্তিকে অমর করে রাখার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত নজরুল একাডেমী'র অন্যতম উদ্যোক্তা ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ছিলেন এমামুয্‌যামান।

অত্যন্ত স্বল্পাহারী এমামুযযামান ছিলেন একজন দক্ষ খেলোয়াড়। একসাথে দুটো রুটিও তিনি খেতেন না। ছোটবেলা থেকেই শারীরিক কসরৎ, ব্যায়াম ও যোগাসন করতেন, আর ঘোড়ায় চড়তেন। প্রিয় খেলা ছিল হাডুডু। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ফুটবলার, মোটর সাইকেল স্ট্যান্ট ও রায়ফেল শুটার। ১৯৫৪ সনে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান দলের অন্যতম রায়ফেল শুটার হিসাবে নির্বাচিত হন। তাঁর বোনও ছিলেন একজন মোটর সাইকেল স্ট্যান্ট ও শ্যুটার যিনি পাকিস্তানের শ্যুটারদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

তিনি চাইতেন বাংলার যুব সমাজ বিদেশি সংস্কৃতির দিকে এমনভাবে ঝুঁকে না পড়ুক যাতে নিজস্ব খেলাধুলা ও সংস্কৃতি অস্তিত্বের সংকটে পড়ে যায়। বর্তমানে আমাদের দেশে জাতীয় খেলা হিসাবে হাডুডু স্বীকৃত হলেও আমাদের নতুন প্রজন্ম নিজের চোখে হাডুডু খেলা কতজন দেখেছে তা খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। এভাবে দিন দিন হাডুডুর নাম নিশানাও হারিয়ে যেতে বসেছে, অথচ এই খেলাটি মানুষের দম, শক্তি, সাহস, ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত সহায়ক। এটি খেলতেও খুব বেশি সময় লাগে না ও বেশি স্থান লাগে না, খেলার জন্য বিশেষ কোনো উপকরণেরও প্রয়োজন হয় না। আল্লাহর রসুলও যে খেলায় মানুষের শরীর গঠন হয়, মানুষ সাহসী, বহির্মুখী ও সংগ্রামী চরিত্রের অধিকারী হয় সে খেলাগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আমাদের দেশের সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীগুলোর সদস্যদের সুস্থ দেহমনের অধিকারী করার জন্য ক্রীড়া হিসাবে কাবাডিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই লুপ্তপ্রায় জাতীয় খেলাকে পুনর্জীবন দেওয়ার জন্য মাননীয় এমামুযযামান প্রতিষ্ঠা করেন তওহীদ কাবাডি দল। তাঁর অনুসারী হেযবুত তওহীদের সদস্যরা অবসর সময়ে কাবাডি, দৌড়, ফুটবল ইত্যাদি খেলে থাকেন। বিভিন্ন সময়ে থানা, জেলা এমন কি জাতীয় পর্যায়েও কাবাডি খেলায় অংশ নিয়েছেন।

আমাদের প্রিয় এই মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রগতি, প্রগতির শিখরে পৌঁছানোর দায়িত্ব আমাদের সকলের। অপরাজনীতি, অনাচার, অসহিষ্ণুতা, জঙ্গিবাদসহ যাবতীয় অপশক্তির কবল থেকে সমাজের মানুষকে মুক্ত করে ন্যায় সুবিচার শান্তির মধ্যে রাখার লক্ষ্যে কাজ করা একাধারে আমাদের এবাদত ও সামাজিক কর্তব্য। একাত্তর সনে শিল্পীরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা যুগিয়েছেন, এখনো তেমনিভাবে শিল্পীরা অন্যায়, অসত্যের বিরুদ্ধে যদি এই এ জাতিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাগানোর জন্য প্রচেষ্টা চালান সেটাও নিশ্চয়ই আল্লাহর দরবারে তাদের এবাদত হিসাবে গণ্য হবে। দেশের সকল সাংস্কৃতিক কর্মী, শিল্পী, সংস্কৃতিমনা ও ক্রীড়ামোদী মানুষের এখন শতধাবিভক্ত এই জাতিকে ন্যায়ের পক্ষে বজ্রকঠিন ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ভূমিকা রাখা খুবই জরুরি।

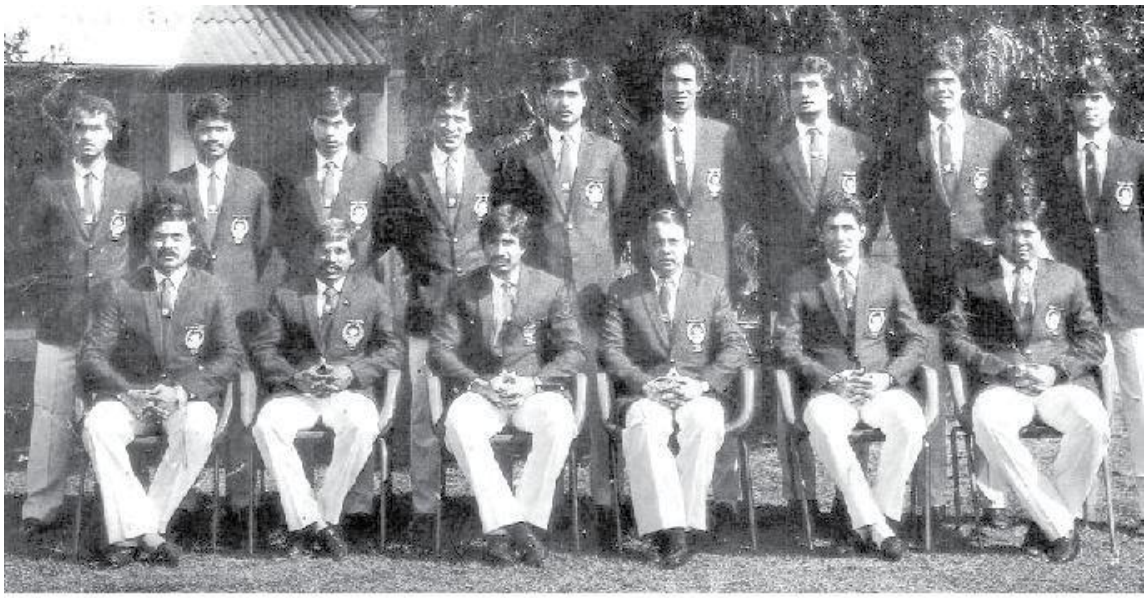

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অঙ্গনে বাংলাদেশের পথচলা শুরু হয়েছিল সেই ১৯৮৬ সালে। গাজী আশরাফ হোসেন এর নেতৃত্বে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে মাঠে নেমেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট দল।

বদলে যাওয়া টাইগার ক্রিকেট

এক থেকে একশ' জয়ের মাইলফলক

পথচলা শুরু হয়েছিল সেই ১৯৮৬ সালে। গাজী আশরাফ হোসেন এর নেতৃত্বে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে মাঠে নেমেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। তবে মোটেও সহজ ছিল না সেই পথচলা। 'জয়' নামক মালাটি গলায় পড়তে বাংলাদেশকে অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘ ১২ বছর। ১৯৯৮ সালে ভারতে আয়োজিত ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টে কেনিয়াকে ৬ উইকেটে হারিয়ে ওডিআই'য়ে প্রথম জয়ের মুখ দেখে আতাহার আলী খানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ দল। এরপর ধীরে ধীরে দিন গড়িয়েছে; সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বদলে গেছে দলের চেহারাও। ২০০৯ সালে দলের ২০৫তম ওয়ানডে'তে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে নিজেদের ৫০ তম জয়টি পায় টাইগাররা। ধীরে ধীরে অপেক্ষার প্রহর সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততর হতে থাকল। মাত্র ৬ বছরের ব্যবধানে নিজেদের ঝুলিতে শততম জয় পুরে নিল বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। গত ১ অক্টোবর নিজেদের ৩১৫ তম ওয়ানডে'তে আফগানিস্তানকে ১৪১ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে ওয়ানডে বিজয়ের 'সেঞ্চুরি' পূর্ণ করে মাশরাফি বিন মুর্তজার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ দল। পুষ্পিত, পল্লবিত, সুশোভিত একটা ফুলের বাগান। সেই বাগানে ফুটে আছে থোকা থোকা ফুল। কমও নয়, বেশিও নয়, পুরো ১০০টি ফুল দিয়ে সজ্জিত হয়ে আছে সেই বাগান। সম্প্রতি শেষ হওয়া আফগান সিরিজের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের সেই শততম জয়টি আসে তামিম ইকবাল, সাব্বির রহমান আর মোশাররফ হোসেনের হাত ধরে। টস জিতে প্রথমেই ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেন মাশরাফি। তামিমের সপ্তম ওডিআই শতক আর সাব্বিরের অর্ধশতকে ভর করে বড় স্কোরের দিকেই এগোতে থাকে বাংলাদেশ। মাঝখানে একটু থেমে গেলেও পরে মাহমুদুল্লাহর ঝড়ো ব্যাটিংয়ে ২৭৯ রানের লড়াকু টার্গেট দেয় মাশরাফি বাহিনী। তবে সেই

টার্গেট যে আফগানদের জন্য মোটেও লড়াকু ছিল না সেটা জানিয়ে দেন টইগার বোলাররা। শুরুতে আফগান শিবিরে মাশরাফির আঘাতের পর দীর্ঘ আট বছরের বিরতির পর দলে ফেরা মোশাররফ হোসেন নিয়ে নেন একে একে তিন উইকেট। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৩৩.৫ ওভারে ১৩৮ রানেই থেমে যায় আফগানদের ইনিংস। ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন ম্যাচে ১৪১ রানের বিশাল জয় নিয়েই মাঠ ছাড়েন সাকিব-তামিমরা।

কয়েক বছর আগেও বাংলাদেশ ক্রিকেটের এই অবস্থা ছিল না। জয়-পরাজয় তো সব সময়ই ছিল; ছিল একের পর এক বাধা অতিক্রম করে নিজেদেরকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর রেকর্ডও। তবে ২০১৪'র শেষের দিকেই যেন বদলে যেতে থাকে টাইগার ক্রিকেট। ওই বছরের ২৬ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া জিম্বাবুয়ে সিরিজ দিয়েই যেন শুরু হয় সাকিব-তামিম-মাশরাফিদের নতুন যাত্রা। ৩ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ও ৫ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের উভয়টিতেই সফরকারীদের 'বাংলাওয়াশ' করে পরবর্তী বছরে আসন্ন বিশ্বকাপে ভালো শুরুর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মাশরাফি-মুশফিকরা। হয়েছিলও তাই; আফগানিস্তানকে বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে হারিয়ে দিয়েছিল মাশরাফি বাহিনী। তারপর একে একে প্রথমবারের মতো উঠে গিয়েছিল কোয়ার্টার ফাইনালে। পরে প্রতিবেশি দেশ ভারতের কাছে হেরে কোয়ার্টারের গণ্ডিতেই শেষ হয়ে যায় বিশ্বকাপ মিশন। তবে বিশ্বকাপের এই সাফল্য থেকে পাওয়া আত্মবিশ্বাস যেন সারা বছরই প্রবাহিত হলো টাইগার ক্রিকেটারদের ধমনীতে। পুরো ২০১৫ সালজুড়ে একটি 'সোনালী বছর' পার করে বাংলাদেশ ক্রিকেট। চলতি বছর আইসিসি'র ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ে প্রথমবারের মতো নিজেদেরকে সাতে স্থাপন করে বাংলাদেশ দল।

শুরুটা হয়েছিল এশিয়ান ক্রিকেটের অন্যতম পরাশক্তি পাকিস্তানকে বিধ্বস্ত করে। বিশ্বকাপের পর প্রথম সিরিজেই বীরদর্পে জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ; হোয়াইটওয়াশের স্বাদ দেয় সফরকারীদের। পরে খুলনা টেস্টে আধিপত্য দেখিয়ে ড্র করে বাংলাদেশ দল। এপ্রিলে পাকিস্তানকে ধবল ধোলাই করার মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া বাংলাদেশের জয়রথ ছুটতে থাকে পরবর্তী সিরিজগুলোতেও। দেশের মাটিতে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও। তারপর আবারও সেই জিম্বাবুয়ে; সেই সাথে আবারও সেই 'বাংলাওয়াশ'। ২০১৪ সালে যে বাংলাদেশ টানা ১২ ওয়ানডেতে হেরেছিল সেই বাংলাদেশই ২০১৬'তে খেলা ১৮ ওয়ানডে'র মধ্যে জিতে নেয় ১৩টিই। সিরিজ হারেনি একটিও। বরং সম্প্রতি আইসিসি'র সহযোগী দেশ আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয়ের ফলে দেশের মাটিতে টানা ৬ সিরিজ জিতল টাইগাররা। বিশ্ব ক্রিকেটে টাইগাররা যেন ক্রমেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে।

সম্প্রতি শেষ হওয়া আফগান সিরিজের শেষ ম্যাচে শততম জয়ের আনন্দে বাংলাদেশি টাইগারা